জীবন জাগার গল্প-১৫

# সেপালকার ইনলাভ

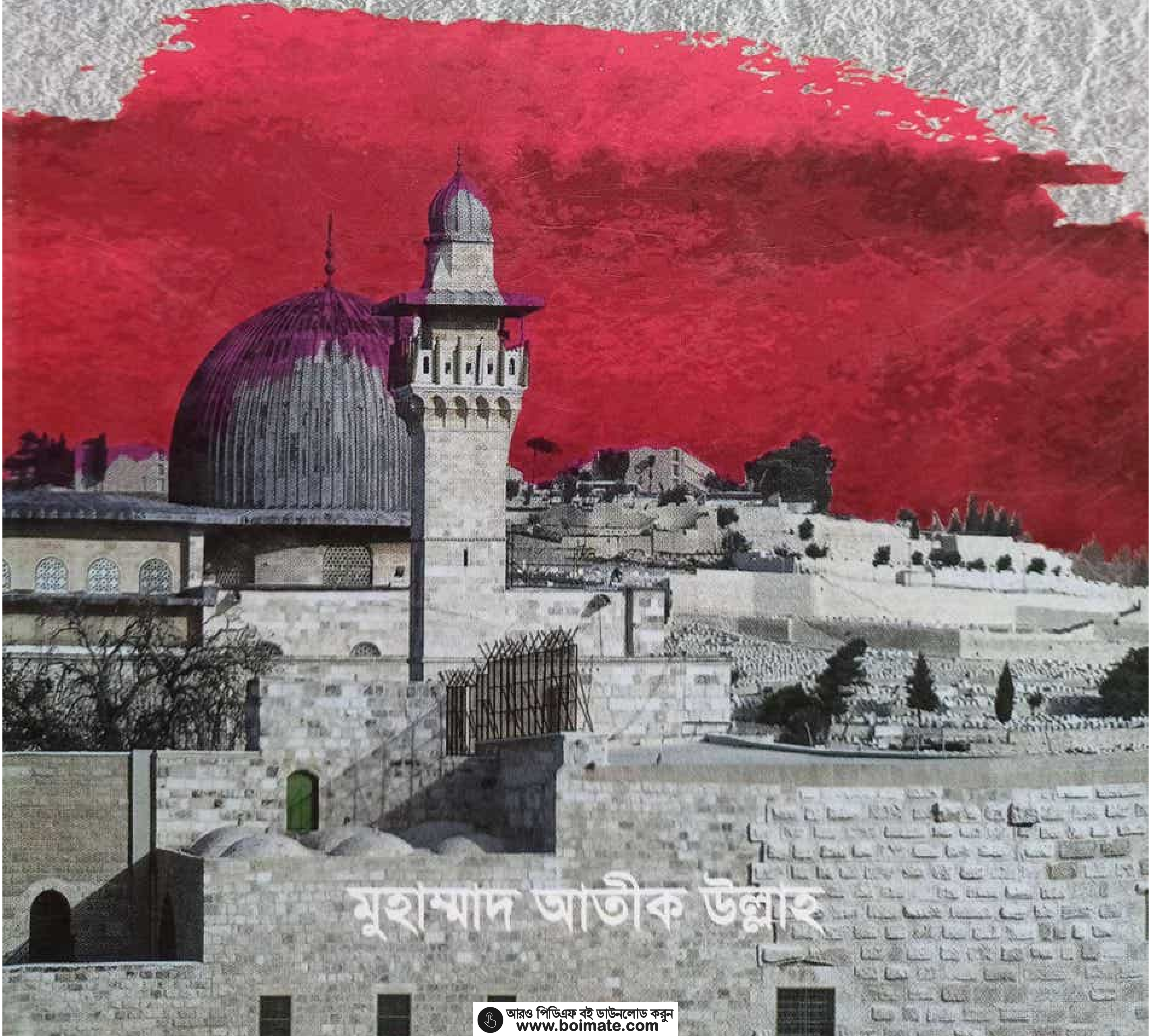

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ।
শিক্ষক পিতা ও গৃহিনী মায়ের চতুর্থ সন্তান। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে জন্ম। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাহাড়ঘেরা পার্বত্য জনপদে, বনবাদাড়ের ভয়জাগানো আদিম পরিবেশে, স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদীর উত্তাল স্রোতে সাঁতার কেটে, বহু উপজাতির নানাবিধ বৈচিত্র্যময় সমাজে, পিত্রালয় ও মাতুলালয় ফেনীর ভাবগম্ভীর ধর্মীয় আবহে।
পড়াশোনার সূত্রে সময় কেটেছে গ্রামবাঙলার নিতান্ত পল্লীর নিটোল গ্রামীণ পরিবেশে, প্রাচীন ধারার কওমী মাদরাসার আমলি আবহে।
পড়াশোনার হাতেখড়ি বাবা-মায়ের কাছে। মাদরাসা-জীবন কেটেছে, মামা মাওলানা সাইফুদ্দীন কাসেমী (দা বা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। তিনি হাকীমুল উম্মতের এর অন্যতম প্রধান খলীফা মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.-এর খাস সোহবতপ্রাপ্ত। ফেনীর ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মাদানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম।
ফলে মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ বেড়ে উঠেছেন খানকাহী মেজাজে, সুনিপুণ তরবিয়তের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তার মাঝে দাওয়াত, তালীম, জিহাদ ও খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক শাসন ও শান্তিবাহিনীর দৌরাত্ম্যে সৃষ্টি হওয়া টানটান উত্তেজনাময় নব্বইয়ের দশক তার মনমননে গভীর রেখাপাত করেছে। পাশাপাশি এই দশকের অবিস্মরণীয় ঘটনা, আফগান জিহাদ তাকে দিয়েছে ভিন্নধর্মী এক চেতনা। বিশ্ব রাজনীতি ও মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তার আছে গভীর পাঠ।
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া থেকে তিনি তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) সমাপ্ত করেছেন। কুরআনের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম প্রতিষ্ঠা করে। যার অন্যতম লক্ষ্য কুরআনের আলোয় আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ। মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ স্বভাবগতভাবে নিভৃতচারী হলেও কাছের মানুষরা জানে তিনি বেশ রসিক। বই পড়া তার পেশা ও নেশা। তার পড়াশোনার ব্যাপ্তি ছুঁয়ে গেছে ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে। অনলাইনে পঞ্চাশেরও অধিক শিরোনামে ধারাবাহিক লেখা লিখে চলছেন বিরামহীনভাবে।
তার লিখিত জীবন জাগার গল্প সিরিজের লেখাগুলো বেশ সুখপাঠ্য। পাঠক অবচেতনমনেই আকৃষ্ট হয় কুরআনের প্রতি। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর লেখাগুলো আমাদেরকে জাগিয়ে তোলে গাফলাতের সুখনিদ্রা থেকে। উদ্বুদ্ধ করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে। আল্লাহ তাঁর কলমকে আরও শাণিত করুন। গোটা বিশ্বকে কুরআনি আলোয় আলোকিত করুন।

-প্রকাশক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

# সূচিপত্র


অবরুদ্ধ বেদুইনকন্যা ................................ ০৯
সেপালকার ইন লাভ ................................ ৪৮
রেসিডেন্সিয়াল গার্লস স্কুল ইন হারার .......... ৭৭



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

# অবরুদ্ধ বেদুইনকন্যা

খার্তুম রেলওয়ে জংশন। একজন চীনাম্যান ভীষণ গোমড়ামুখে বসে আছে। পেশায় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার। মানুষটাকে প্রায়ই দেখা যায়, পুরোনো রেললাইনের ধারে বসে বসে আকাশ-পাতাল কী যেন ভাবছে। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের ডানা মেলে ওড়া চিল দেখছে। চীনের মানুষকে ভাবুক বলে মনে হয় না। তাদের দেখলে বা তাদের কথা শুনলে মনে হয়, তারা রোবটবিশেষ। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না। ধর্মকর্ম নেই। যন্ত্রবৎ। কিন্তু আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকা মানুষটাকে দেখলেই কবি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। প্রথম প্রথম সবাই অবাক হলেও এখন সবার সয়ে গেছে। এতবড় একজন অফিসার! সুদান সরকার তাকে পারলে মাথায় করে রাখে! রেল ইঞ্জিনের এমন কোনও সমস্যা নেই, যা লোকটা সমাধান করতে পারে না। প্রাচীন মান্ধাতার আমলের লক্কর-ঝক্কর ইঞ্জিনও তার জিয়নস্পর্শে কোনও এক যাদুমন্ত্রবলে গা ঝাড়া দিয়ে ভোঁওওও করে স্টার্ট নেয়।

***

চারদিকে গিজগিজে কালো মানুষের ভিড়ে, বোঁচা নাকের একজন শাদা মানুষকে বিসদৃশই মনে হতো। আস্তে আস্তে সয়ে গেছে। অন্য আর দশজন চীনার মতো মানুষটার চেহারা অতটা মঙ্গোলয়েড নয়। চেহারাটাও বেশ মায়াবী। ইংরেজি ভাষাটা সুদান আসার আগেই শেখা ছিল, এখানে আসার পর আরবীটাও বেশ ভালো রপ্ত করেছে। উচ্চারণে সমস্যা থাকলেও সেটাকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। আগে এখানে কাজ করত মার্কিন ও জার্মান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইঞ্জিনিয়ার। তারা চীনাদের মতো এতটা মিশুক ছিল না। হামবড়া ড্যামকেয়ার ভাব নিয়ে তারা থাকত। নিজেদের একান্ত পরিমণ্ডলে। একটা বানোয়াট পরিসরে। কল্পিত সুপিরিয়রিটিতে। সুদানে চীনাদের আসার ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়!

***

চীন শুরু থেকেই আফ্রিকার সাথে সম্পর্কোন্নয়নের প্রতি আগ্রহী ছিল। গত কয়েক বছরে আফ্রিকার সাথে চীনের সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে। বিশেষ করে সুদানের সাথে। এখানকার রেলব্যবস্থা প্রায় পুরোটাই গণচীনের মুখাপেক্ষী। আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধের পর, সুদানের রেলবিভাগ আস্তে আস্তে গণচীননির্ভর হয়ে পড়ে। আগের জার্মান ও মার্কিন ইঞ্জিনগুলো বিকল হতে শুরু করে। বোকা আমেরিকা গোঁ ধরে অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। জীবন থেমে থাকে না।

সুদানের জীবনযাত্রা রেলনির্ভর। প্রয়োজনের তাকিদে ভিন্ন উপায় খুঁজতে শুরু করে তারা। পথ পেতে দেরিও হয় না। চীন এগিয়ে আসে। তারা সর্বান্তঃকরণে সুদানের থমকে যাওয়া রেলবিভাগকে সচল করে তোলে। নিবিড় নিষ্ঠায়। লোকবল-অর্থবল-যন্ত্রবল দিয়ে। স্থবির হয়ে আসা রেলস্টেশনগুলো আবার হেসে ওঠে। ছোঁয়া লাগে প্রাণের।

***

চীন থেকে আসা কর্মকর্তাদেরই একজন হলো আমীর যাদ। এটা তার মূল নাম নয়, কাগজে-কলমে লি হুয়ান নামেই পরিচিত। এখানকার সহকর্মীরাও তাকে *লি* বলে ডাকে। তবে সুদানিদের কাছে, আসল নাম না বলে, ভিন্ন নাম বলার সুপ্ত একটা কারণ আছে। সাংহাইতে তার বেড়ে ওঠা। পড়াশোনাও সেখানে। ছোটবেলা থেকেই রেলের প্রতি ঝোঁক! ভালোলাগা বিষয় নিয়েই পড়াশোনা। নেশাই এখন পুরোদস্তুর পেশায় পরিণত হয়েছে। তার সাথে আসা অন্য ইঞ্জিনিয়াররা যেখানে অফিসটাইম করে দায়িত্ব শেষ করে, আমীর যাদ সেখানে বলতে গেলে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই বেগার খেটে যাচ্ছে। এতে চীনা ও সুদানি কর্তৃপক্ষ উভয়ই তার প্রতি বেজায় খোশ!

বয়েসে সবার চেয়ে কনিষ্ঠ হলেও পদে গরিষ্ঠ হতে দেরি লাগল না। তার একটা হবি হলো ট্রেনে চড়ে সুদানের দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত শহরগুলো দেখতে যাওয়া। মরুভূমির প্রতি তার আজন্ম আকর্ষণ। ট্রেন যখন মরুভূমির বুক চিড়ে হু-হু করে এগিয়ে যায়, তার মনে হতে থাকে, জীবনটা এভাবে কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ হতো না। বেশির ভাগ ট্রেনযাত্রায় চালকের সাথেই বসে আমীর যাদ। এভাবে তার সখ্য গড়ে উঠেছে অনেক চালকের সাথে। একজনের সাথে একটু বেশিই দহরম-মহরম! উসমান মাহজুব। বয়েসের দীর্ঘ ব্যবধান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাকলেও দূরপাল্লার যাত্রায় অনেকটা সময় একসাথে থাকার কারণে, অসম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

***

হাশিখুশি মিশুক আমীর যাদকে হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে থাকতে দেখে, তার বসভেবেছিলেন বাড়ির জন্যে মন খারাপ! জোর করে ছুটি দিলেন। বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে বললেন। আমীর সবিনয়ে ছুটি প্রত্যাখ্যান করে বলল:

-বাড়ি গেলে মন খারাপ ভালো হবে না। এখানেই থাকি! আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে!

কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পরও সমস্যা কাটল না। কাজে-কর্মে কোনও ফাঁকি নেই, সব ঠিকঠাক মতোই চলছে। তবে কোথাও যেন সুতো ছিঁড়ে গেছে। প্রাণের ছোঁয়া নেই। চীন থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ারদের আলাদা একটা ডেরা আছে। সেখানে তারা দু-তিনজন করে করে একটা রেলবগিতে থাকে। আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থাই সেখানে আছে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ইন্তেজাম যৌথ। খাবার টেবিলে আমীর যাদের বিমর্ষ ভাব অন্যদের কষ্টের কারণ।

***

সুদানিদের মধ্যেও বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমীর যাদের হয়েছে এক সমস্যা! সে সবকথা নিজের দেশোয়ালি ভাইদের বলতে পারছে না, নিরাপত্তার কারণে। আবার সুদানিদের সাথেও কষ্টের কথা শেয়ার করতে পারছে না। উসমান মাহজুবের সাথে সব সময় দেখা হয় না। উনি সব সময় ট্রেনেই থাকেন। আজ এ শহর, কাল ও শহর করেই তার দিন কাটে। তবে খার্তুমে ট্রিপ নিয়ে এলে, যেভাবেই হোক, একবার আমীরের সাথে দেখা করা চাই-ই! প্রতিবারের মতো এবারও যখন খার্তুম এলেন, অভ্যেসবশত একবার আমীরের সাথে দেখা করতে এলেন। দেখেই ধাক্কামতো খেলেন! আগের বার কী দেখে গেলেন, এবার কী দেখছেন! চোখের নিচে কালশিটে! হনু বেরিয়ে আছে। গায়ের রঙে কালো ছোপ পড়েছে। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে!

-আমীর, আপনার এই অবস্থা কেন?

-নাহ, এমনিতেই শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে!

-আপনার মতো টগবগে যুবকের শরীর খারপহয়ে এমন হয়ে যাবে, বিশ্বাস করা মুশকিল!

-আচ্ছা, না বলতে চাইলে থাক! আমি একটা সুসংবাদ নিয়ে এসেছি!

-কী সুসংবাদ?

-আপনি বলেছিলেন, তালা'ফার অঞ্চলে আমার ট্রিপ পড়লে আপনাকে বলতে! এবার ট্রেন নিয়ে ওদিকে যাচ্ছি! যাবেন ?

-যাব!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

***

ট্রেনে চড়লে আমীরের মেজাজ সব সময়ই আমীরানাহ হয়ে ওঠে। মুখে কথার খই ফোটে। নিজেই চা বানিয়ে উসমানকে দেয়। স্টোভে রান্না চড়িয়ে দেয়। স্টেশন থেকে কেনা বুনো বকের গোশত কুটতে বসে! বেশ সংসারী চেহারা! এবার সেসবের কোনও আলামত দেখা গেল না। উসমান মাহজুব সত্যি সত্যি উৎকণ্ঠা বোধ করলেন। বড় ধরনের কিছু না হলে এমনটা হওয়ার কথা নয়।

-সাদিক, আপনি আমাকে আপন মনে করেন?

-করি! অনেক বেশিই করি!

-তাহলে আমাকে আপনার কষ্টের কথা খুলে বলছেন না কেন?

-একটা শর্তে বলতে পারি! আমি এখন যা বলব, কাকপক্ষীও যেন টের না পায়! বিশেষ করে আমার দেশি সহকর্মীরা যেন জানতে না পারে!

-আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন!

-আপনার সাথে সেবার আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে আপনার কাদেরীয়া তরীকার পীরের দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। মনে পড়ে?

-মনে পড়বে না কেন! আমরা সেখানে সারারাত যিকির করেছি! পীর সাহেবের দু'আ নিয়েছি!

-সেখান থেকে ফিরে আসার পর আপনার সাথে দীর্ঘদিন আর দেখা হয়নি। আপনি অন্য রুটের দায়িত্বে ছিলেন। আমার কাছে সেই রাতের কাজটা বেশ ভালো লেগেছিল। এভাবে গানের তালে তালে যিকির করা, ঢোল-তবলা বাজানো! ধেই ধেই করে নাচা! সত্যি মনোমুগ্ধকর একটা রাত! আমি খার্তুমে ফিরে এসেই বিভিন্ন খানকায় যাতায়াত শুরু করলাম! কেমন যেন মোহে পড়ে গেলাম! আমাদের চায়নিজ জীবনে এ-ধরনের ধর্মীয় উৎসব তো দূরের কথা, ধর্মের চিহ্নও নেই! পাশাপাশি সূফিবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করলাম। আপনার শুনতে অবাক লাগবে! সুদানে সবমিলিয়ে প্রায় পঁচিশটারও বেশি সূফী তরীকা আছে। অল্প কয়েকটা ছাড়া প্রায় সব তরীকারই একটা বা একাধিক খানকা আছে রাজধানী খার্তুমে!

নিয়মিত আসা-যাওয়ার সুবাদে কিছু মানুষের সাথে বেশ সখ্যগড়ে উঠেছিল। তাদের একজন আমাকে প্রস্তাব দিল, তার গ্রামের বাড়িতে ঘুরে আসতে। গ্রাম মানে বাদিয়া। দক্ষিণ সুদানের দারফুরে! আমি এককথায় রাজি হয়ে গেলাম!

-দারফুরে? তা হলে তো ঘটনা বেশ আগের!

-হাঁ, দারফুর স্বাধীন হওয়ার মাসখানেক আগের ঘটনা!

-আশ্চর্য! আপনি দারফুরে গেলেন, আমি জানতেও পারলাম না! তা হলে আমিও যেতাম! আমার শ্বশুরবাড়িও দারফুরে জানেন তো!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-জি আপনি বলেছিলেন!

-তারপর?

-দারফুরে তখন স্বাধীনতা আর গণভোটের প্রস্তুতি চলছে। আমরা এমন গোলযোগময় সময়ে পৌঁছলাম। তার বাড়িটা বেশ রক্ষণশীল! তারা সূফী ঘরানার। কিন্তু তাদের চলন-বলন অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন! আমি ভেবেছিলাম অন্যদের মতো তারাও গান-বাদ্যি, ঢোল-তবলা বাজিয়ে যিকির করে! ছেলে-মেয়ে একসাথে নাচে! তেমন কিছুই দেখা গেল না। যিকির হয়, তবে গান-বাদ্যি ছাড়া। এখানে নারীদের দেখাই যায় না। যিকিরে বসা তো দূরের কথা।

আনন্দের কোনও উপকরণ না পাওয়াতে দিনগুলো বড়ই পানসে আর ম্যাড়মেড়েভাবে কাটছিল। আমি ভেবে এসেছিলাম এখানে জম্পেশভাবে নেচেগেয়ে কিছু আনন্দকর সময় পার করব! তা হলো না। কেমন যেন নীরস! এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল!

-কী ঘটনা?

-আমি যার সাথে গিয়েছিলাম, তার বাবাই ছিল পীর। একজন সত্যিকার ভদ্রলোক। অন্য পীরদের মতো গান-বাদ্যি নিয়ে পড়ে থাকেন না। পোশাক-পরিচ্ছদও আর দশজন সুদানির মতোই। মানুষটা বেশ শিক্ষিত, কথা বললেই টের পাওয়া যায়। তাকে দেখি সারাদিনই বসে বসে কুরআন শরীফ পড়ছেন অথবা হাঁটার সময় তাতে ইয়াব্বড় এক তাসবীহ নিয়ে কিছু একটা জপছেন!

***

সে এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত হলেও, পাশের গ্রামটা ছিল খ্রিষ্টান। আমি আর আলি, মানে যার সাথে গিয়েছি, একসাথে ঘুরে বেড়াই! শিকার করি। বালুতে চুলা বানিয়ে রান্না করে খাই। রাত হলে তাঁবুতে নাক ডেকে ঘুমাই। একদিন আমরা শিকার থেকে ফিরে এসেছি। আলির পিতা তাকে ডেকে নিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পর আলি থমথমে মুখে আমার কাছে এসে বসল। আমি তার মন খারাপের কারণ জানতে চাইলাম। প্রথমে বলতে না চাইলেও, আমার পীড়াপীড়িতে সে মুখ খুলল:

-আমীর, তুমি দারফুরের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানো। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, এখানকার খ্রিষ্টানরা সবাই দেশভাগের পক্ষেই রায় দেবে। আমরা যারা মুসলমান আছি, তাদের অস্তিত্ব রীতিমতো হুমকির মুখে পড়বে। আমার একটা ছোট বোন আছে। হাশমা।

-তোমার ছোট বোন আছে? কখনো দেখিনি যে! পরিচয় করিয়ে দিলে না!

-ও পর্দা করে! মুসলিম মেয়েরা অপরিচিত মানুষের সামনে যায় না!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

-খার্তুমে তো দেখি নারী-পুরুষ একসাথে যিকির করে?

-ওরা ধর্মকে ঠিকমতো মানে না, তাই এমন করে! এভাবে নারী-পুরুষ মিলে, গান-বাদ্যি করে যিকির করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। এমন করলে গুনাহ হয়!

-আচ্ছা এসব নিয়ে পরে কথা বলব! তোমার বোনের কথা কী বলছিলে যেন!

-জি, আমাদের এখানে একটা রীতি আছে, মেয়েশিশু জন্ম নেয়ার পরপরই তার বিয়ে ঠিক করা হয়ে যায়। নিজ বংশেরই কারও সাথে। পরে বড় হলে বিয়ের রুসমত সারা হয়। আব্বা অবশ্য এসব প্রথা মানেন না। কিন্তু দাদু নিজে থেকেই আমার এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে হাশমার বিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন।

-অবাক করা ব্যাপার! এমন কেন করা হয়?

-নিজেদের মেয়ের অন্য গোত্রে যাওয়া ঠেকাতেই মূলত এই প্রথা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সুদানের অনেক গোত্রই আরব থেকে আসা। এ ধরনের প্রথা আরবদের মধ্যে এখনো প্রচলিত আছে।

-এখন কি কোনও সমস্যা হয়েছে?

-দারফুরে এখন যে স্বাধীনতার আয়োজন চলছে, সেটার পেছনে আছে পাশ্চাত্যশক্তি। ইসরায়েলও শক্তভাবে কলকাঠি নাড়ছে! বিদ্রোহী খ্রিষ্টান নেতা সালভাদর কিরের সাথে ইহুদীদের সরাসরি সম্পর্ক! ইসরায়েল চায় আফ্রিকাতে তার একটা শক্ত অবস্থান তৈরি হোক! নিজস্ব একটা ঘাঁটি হোক! দক্ষিণ সুদানের রাজধানী জুবাতেও তাদের বড় এক অফিস আছে।

তো যা বলছিলাম, অনেক আগে থেকেই এখানে খ্রিষ্টান মিশনারিদের বেশ আনাগোনা। তারা প্রকাশ্যেই তাদের অপতৎপরতা চালায়। টাকার বিনিময়ে দরিদ্র মুসলমান ও প্রকৃতিপূজারি সুদানিদের তারা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। আমার চাচাতো ভাই ও তার পরিবার যদিও গরিব নয়, কিন্তু কীভাবে যে সে খ্রিষ্টানদের টাকার মোহে পড়ে যায়। বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে সে এখন খ্রিষ্টানদের বড় নেতা। সালভাদর কিরের সাথেও তার ওঠাবসা! গত কয়েকদিন আগে সে এসে আব্বুকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে, দাদুর কথা। তার সাথে হাশমার বিয়ে হওয়ার কথা!

আব্বু এক কথায় নাকচ করে দিয়েছেন! সে চক্ষুলজ্জার কারণে আব্বুর সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি, তবে আম্মুর সাথে দেখা করে সে বলে গেছে! আপসে আপ বিয়েটা না হলে, সে জোর খাটাতে বাধ্য হবে! আম্মু বলেছেন:

-তুমি খ্রিষ্টান হয়ে গেছ! কীভাবে বিয়ে হবে?

-আমি এতকিছু বুঝি না, দাদুর [illegible] পূরণ করতেই হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-খ্রিষ্টান হওয়াটাও দাদুর ইচ্ছেয় হয়েছিলে?

-আমি তর্ক করতে আসিনি! একসপ্তাহ সময়! এরমধ্যে আপনার নিজে থেকে আয়োজন না করলে, আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করে আসব! আর বিয়েটা হলে আপনাদেরই লাভ! এখানে নিরাপদে থাকতে পারবেন। আমি প্রোটেকশন দিয়ে রাখব। কেউ কিছু বলবে না। নইলে খ্রিষ্টানরা বাড়িঘর ছাড়া তো করবেই, জান নিয়েও টানাটানি পড়ে যেতে পারে!

-হাশমার প্রতি তার এত আগ্রহ কেন?

-আগ্রহ হওয়ারই কথা। হাশমা জ্ঞানেগুণে আমাদের বংশের মেয়েদের মধ্যে সবার সেরা বলা না গেলেও, সে অনেক ভালো একটা মেয়ে। উচ্চশিক্ষিতা। খার্তুমে থেকেই সে পড়াশোনা করেছে। বাবার কাছে ধর্মীয় শিক্ষা পেয়েছে, আমার চেয়েও অনেক ভালো করে। কুরআন হেফয করেছে। হেফয অবশ্য আমাদের বংশের সব মেয়েই করে। তুমি দেখেছ বোধ হয়, আমাদের বাড়ির মসজিদের সামনে কাঠের পাত ডাঁই করে রাখা আছে?

-হাঁ, দেখেছি! কিসের ওগুলো?

-সেগুলো লাওহে কুরআনী! আমাদের এখানকার রীতি হলো, কাগজের কুরআন না পড়া। কাঠের পাতে প্রতিদিনের পাঠ লিখে লিখে শিখে নেয়া। একটা পাঠ মুখস্থ হয়ে গেলে, সেটা মুছে ফেলা হয়, তারপর আরেকটা পাঠ লেখে। ওস্তাদ পুরো ব্যাপারটা তদারক করেন।

-সুন্দর ও প্রাচীন ব্যবস্থা দেখছি!

-হাঁ, বেশ উপকারী! এভাবে পড়লে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। রাতের বেলার পড়ার পদ্ধতিটাও বেশ মজার! মসজিদের সামনে বিরাট চত্বর থাকে। সেখানে মাঝ বরাবর বিরাট এক অগ্নিকুণ্ডলী জ্বালানো হয়। আগুনের চারপাশে বসে বসে ছাত্ররা পড়া মুখস্থ করে। শিক্ষক কুণ্ডলীর চারপাশে চক্কর দিতে থাকেন। কারও পড়া হয়ে গেলে, তাকে বলা হয়, পুরো পড়াটা একবার হেঁটে হেঁটে পড়ে আসো। আরেক বার দৌড়ে দৌড়ে পড়বে! তারপর তোমার পড়া শোনা হবে!

-মজার ব্যবস্থা!

-হাশমাও আমাদের গ্রামের 'দাইর' মানে মাদরাসায় পড়া শেষ করেছিল। তারপর রাজধানীতে পড়তে গিয়েছে। ওখানে আমার খালার বাসায় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে।

-কী বিষয়ে?

-আব্বু চেয়েছিলেন, আমি যেন তেল-গ্যাস খনিজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে পড়ি! কারণ, দক্ষিণ সুদানে তেল-গ্যাসের বিশাল মজদ! এখনিজ সম্পদ ঠিকমতো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাজে লাগানোর জন্যে শিক্ষিত জনবল দরকার! আমার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ না থাকার কারণে, বোনকেই এবিষয়ে পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করেন। হাশমা অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রী। মেধাবীও বটে।

-সমস্যার কথা কী বলেছিলে?

-আমরা তাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছি! তাকে যেকোনওমূল্যে খার্তুমে সরিয়ে নিতে হবে। আমি সাথে করে নিয়ে যেতে পারব না! কারণ, চারদিকে পাহারা বসানো। আব্বু বারবার নিষেধ করেছিলেন হাশমাকে! সে যেন এবারের ছুটিতে বাড়িতে না আসে! এখানকার পরিস্থিতি ভালো নয় মোটেও!

-আমি কি কিছু করতে পারি এব্যাপারে?

-তোমাকে দিয়ে কাজ হতে পারে! তুমি বিদেশি! তোমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়!

-কী সমস্যা?

-একে তো তুমি মুসলিম নও! দ্বিতীয়ত তুমি বেগানা! মানে পরপুরুষ! ইসলামী আইনে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী, বাপ-ভাই-স্বামী ছাড়া আর কারও সাথে দূরের সফর করতে পারে না। আব্বা যেমন অত্যন্ত রক্ষণশীল, হাশমাও তেমনই। সে উচ্চশিক্ষিতা হয়েও পর্দা মেনে চলে পুরোপুরি। যদিও আমাদের সুদানি সমাজে পর্দাকরা মেয়ের সংখ্যা খুবই কম!

-আমার খুবই ইচ্ছে করছে তোমাদের এই বিপদে আমি কিছু একটা করি! খুউব ইচ্ছে করছে! এজন্যে আমি যেকোনও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত! যেকোনওঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত! আমি খবর পাঠালে, জুবার রেলজংশন থেকে ল্যান্ডরোভার পাঠিয়ে দেবে! ওখানে আমার এক ব্যাচম্যাট কর্মরত আছে। সাংহাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমরা একই ডিপার্টমেন্টে পড়েছি!

-আচ্ছা, আমি আব্বা-আম্মা আর হাশমার সাথে কথা বলে দেখি!

-আলি! তুমি জানো, আমি সুদানকে পছন্দ করি। সুদানের লোক-সংস্কৃতিকে ভালোবাসি। এখানকার মানুষকে ভালোবাসি। আর তোমাদের এখানে এসে মনে হয়েছে: ইশ! আমি যদি এখানেই জন্মাতাম! তোমাদের পরিবারের নিখাদ ধার্মিকতা আমাকে সত্যি সত্যি অবাক করেছে। এতদিন একরকম জেনেছি, তোমাদের এখানে এসে আমার জানার ধরন পুরোটাই ওলট-পালট হয়ে গেছে! শুধু মনে হচ্ছে, আমি বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করছি! তুমি আমার ব্যাপারে কোনও দ্বিধা কোরো না! তোমার বোনকে সাহায্য করতে পারলে, আমার ভীষণ ভালো লাগবে! এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘরের পরিবেশটা গুমোট। আলি তার আব্বু-আম্মুর সাথে বসে আছে। একটু পর হাশমাও সেখানে এল। এক অসহ্য নীরবতা পুরো কামরাজুড়ে বিরাজ করছে। কারও মুখ দিয়েই কথা সরছে না। থমথমে অবস্থা। কিছু নীরবতায় সরবতা লুকিয়ে থাকে। কান্না লুকিয়ে থাকে। আলি আর থাকতে না পেরে মুখ খুলতে বাধ্য হলো:

-আব্বু, সময় তো আর বেশি বাকি নেই! কিছু একটা করা দরকার! শিঘ্রই। নইলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাবে!

-আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন। ইনশাআল্লাহ, তিনিই হেফাযত করবেন। আমি আমার মেয়েকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছি। পর্দার মধ্যেই লালনপালন করেছি। তারপরও আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে! কিন্তু আপাতত কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না!

-আমার সাথে যে মেহমান এসেছে, সে একটা প্রস্তাব দিয়েছে। সে হাশমাকে নিরাপদে খার্তুমে পৌঁছে দিতে পারবে!

-কীভাবে? আমরা স্থানীয় হয়ে পারছি নে!

-খ্রিষ্টানরা চীনাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ করতে চাইবে না। রেল ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্যে তারা চীনের মুখাপেক্ষী।

-আমি আমীরের সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই!

-আব্বু, আরেকটা ব্যাপারও এখানে আছে! আমীর অবশ্য সরাসরি কিছু বলেনি। তবুও তার কথার ধরনধারনে যা বুঝলাম, সে আকারে-ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছে!

-বিয়ে কী করে সম্ভব? একে তো ভিন্নধর্মাবলম্বী! তার ওপর ভিনদেশি!

-তা অবশ্য ঠিক। তবুও আপনি একবার কথা বলেই দেখুন না। সে শুধু বিয়ের প্রস্তাবই দেয়নি। হাশমাকে খার্তুমে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছে। হয়তো উদ্ধারপ্রক্রিয়ার অংশ হিশেবেই পরোক্ষভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে, সে আদপেই কোনও প্রস্তাব দেয়নি। আমার বুঝতে ভুল হয়েছে!

-আচ্ছা, চলো তার সাথে কথা বলে দেখি!

***

বাবা বললেন:

-আলি, আমি আমীরের সাথে একটু একাকী কথা বলি! তুমি একটু বাইরে থাকো! সময় হলে তোমাকে ডাকব! আমীর, তুমি আমার সামনে এসে বসো! তুমি কি আলিকে কিছু বলেছিলে?

-আমি যদি আপনাদের কোনও কাজে আসতে পারতাম, ভালো লাগত! আলির বোনকে আমি খার্তুম পৌঁছে দিতে পারব। আপনারা যদি সম্মত হন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-তুমি কি জানো, আমাদের ইসলামধর্মে পরপুরুষের সাথে একজন নারী দূরপাল্লার সফর করতে পারে না!
-বিপদের সময় হলে?
-জীবন-মরণ সমস্যা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা!
-আপনার চাইলে এসমস্যার সমাধান শরীয়তসম্মতভাবেও করতে পারেন!
-তুমি কি বিয়ের কথা বলছ?
-জি।
-বিয়েটা হতে যে কিছু বাধা আছে, সেটা কি জানো?
-জি, জানি। তবে আপনারা যদি ধর্মকে বাধা মনে করেন, আমি বলব সে বাধা নেই! আমি জন্মগতভাবে একজন মুসলিম। অবশ্য সরকারি কাগজপত্রে আমি একজন 'কমিউনিস্ট'। বন্ধুদের কাছেও তা। এছাড়া আর কোনও সমস্যা আছে?
-তুমি মুসলিম? এটা তো আগে জানতাম না। আলি বলেনি তো!
-আলি ব্যাপারটা জানে না। আলি কেন, কেউই জানে না। জানলে আমার এবং আরও কিছু মানুষের নিরাপত্তায় মারাত্মক সমস্যা দেখা দেবে!
-তুমি একজন মুসলিম। এর বেশি আর কিছু আমাদের আপাতত দরকার নেই। অবশ্য আমি বললেই হবে না। হাশমা আর তার মায়েরও সম্মতি থাকতে হবে। তাদের মা একজন সুদানি জামাই পেতেই বেশি পছন্দ করবে। কিন্তু এখন সেসব ভাবার ফুরসত কই!
-ওনারা যদি সম্মত থাকেন, তা হলে আমি হাশমার সাথে একটু কথা বলতে চাই! কিছু কথা তার জানা থাকা উচিত। সব জানার পরও যদি আমার ব্যাপারে তার আপত্তি না থাকে, তা হলে আজকেই এই বিয়ে হতে পারে!
-আচ্ছা, তুমি এখানেই বসো! আমি তাদের সাথে কথা বলে, হাশমাকে পাঠাচ্ছি!

***

আমীর যাদ একাকী বসে আছে। আকাশ-পাতাল ভাবছে। অনিশ্চয়তার দোলাচলে দুলছে তার মন। পাত্রী না দেখেই প্রস্তাব দিয়েছে। শুধু শুনেছে তার জ্ঞান-গরিমা আর ধার্মিকতার কথা। নানা গুণপনার কথা। এটুকুই কি যথেষ্ট নয়? গায়ের চামড়া নিয়ে সে কখনোই ভাবে না। এটা নিয়ে তার মনে কোনও ধরনের বিকার নেই। সংকোচ নেই। সুদানে কাজ করতে এসে, এখানকার মানুষগুলোকে দেখে মনে হয়েছে, এরা কত সহজ-সরল। তাদের মধ্যে কোনও গরল নেই। চেহারা দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়! চেহারা আর ক'দিন! মনের সৌন্দর্যটাই অমলিন থাকে চিরদিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমীর বসে বসে ভাবছে, আলি এল এমন সময়। তার ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি! অবশ্য আলি এমনিতে সব সময় হাসিমুখেই থাকে।

-মাথা নুইয়ে কী ভাবছিলে এত গভীরভাবে?

-ভাবছিলাম আমার অতীতের কথা। ভবিষ্যতের কথা। বর্তমানের কথা। আমি তোমার আব্বুকে যা বলেছি, তা কি শুনেছ?

-হাঁ শুনেছি! সে ব্যাপারে কথা বলতেই তো এলাম। তুমি কি সত্যি সত্যি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ? এটা কি বিপদে সাহায্য করার জন্যেই শুধু? এমন হলে বিয়ের প্রাসঙ্গিকতা অনেক সময় পরে হালকা হয়ে যায়। স্ত্রী অবহেলার শিকার হয়ে পড়ে!

-না না, কী বলছ তুমি! হাঁ, এটা বলতে পারে, আমার প্রস্তাবের অন্যতম একটা কারণ 'বর্তমান পরিস্থিতি'। কিন্তু এটাই সবটা নয়। আমার অতীত সম্পর্কে তুমি জানো না। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলি : আমি আর চীনে ফিরতে চাই না। সুদানে হোক বা অন্য কোথাও হোক, সেখানেই বাস করতে চাই!

-আচ্ছা, নিশ্চিত হলাম। তোমার জীবনের 'না-বলা-কথা' পরে শোনা যাবে! তুমি হাশমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলে?

-হাঁ, সে যদি রাজি থাকে আরকি! ভুল বুঝো না! আমি তাকে দেখা বা তার চেহারা যাচাই করার জন্যে নয়, আমার কিছু কথা তাকে বলার জন্যেই মুখোমুখি হতে চেয়েছি!

-তুমি ব্যতিব্যস্ত হোয়ো না। তোমার বিব্রত হওয়ারও কোনও কারণ নেই। বিয়ের আগে পাত্র ইচ্ছা করলে, পাত্রীকে দেখতে পারে। এবং দেখাটাই ভালো। শরীয়তসম্মত। বাস্তবসম্মত তো বটেই! চলো আমাদের বাড়ির বাগানে গিয়ে বসবে।

***

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই হাশমা এল। সপ্রতিভ ভঙ্গিতেই সামনে বসল। তার ভাবভঙ্গি দেখে উল্টো আমীরই কিছুটা কুঁকড়ে গেল। হাশমাই কথা শুরু করল:

-আপনি আমাকে কিছু বলতে চান শুনেছি!

আমীর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। প্রথম কথাটাই যা কঠিন। একবার শুরু হয়ে গেলে, আর সমস্যা থাকে না। আপন গতিতেই কথা সামনে বাড়ে!

-জি। আমার অতীতে এমন কিছু ঘটনা আছে, যা আপনার বিয়ের আগেই জানা থাকা প্রয়োজন!

-আপনি কি অতীত জীবনের কোনও পাপের কথা শোনাতে চাচ্ছেন?

-নাহ। আমি যা শোনাতে চাচ্ছি, সেটা পাপের নয়। আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু কষ্টের কথা। খুবই কষ্টের!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-সামান্য একটু ইঙ্গিত দিন। বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। আপনি ভাইয়ার বন্ধু। আমার ভাইয়া কোনও খারাপ মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। এটা আমার বিশ্বাস। আর আপনাকে যেহেতু আমাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এসেছে, তা হলে আমি ধরে নিতে পারি, সে আপনার প্রতি পুরোপুরি আস্থা রাখে। আপনার সম্পর্কে আমার এরচেয়ে বেশি কিছু জানার প্রয়োজন ছিল না। আপনি একজন মুসলিম, সেটা জানার পর, আব্বুরও কোনও আপত্তি নেই। আম্মু একটু অমত করলেও, আব্বু-ভাইয়ার যুক্তির সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি।

-হাশমা, আমার আগে একবার বিয়ে হয়েছিল! এবং কষ্টকর স্মৃতিটাও বিয়েকে ঘিরেই?

-ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর! তবুও আপনার কথার ভঙ্গিতে বুঝতে পারছি, সে বিয়ে টিকে নেই!

-অনেকটা তা-ই! তুমি চাইলে সব খুলে বলতে পারি! টিকে নেই বললে, একটু অন্যরকম শোনায়, আসলে বিয়ের মানুষটা নেই।

-ইন্নালিল্লাহ, থাক এখন আর বেশি কিছু শোনার দরকার নেই! পরে সময় করে শুনব! আপনি সততার পরিচয় দিয়েছেন। আমিও আপনার সততার প্রতি আস্থা পোষণ করলাম!

***

বাড়তি কোনও আয়োজন ছাড়াই বিয়ে হয়ে গেল। একান্ত ঘরোয়াভাবে। অনাড়ম্বর আয়োজনে। অতি কাছের কিছু আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন। অতি সঙ্গোপনে সারা হলো যাবতীয় কার্যক্রম। বাসর রাতে হাশমার প্রথম কথাই ছিল:

-আমাদের কামরায় অনেকগুলো ফুল আছে! সবচেয়ে বড় দুটো ফুলের একটা বাসি, আরেকটা তাজা!

-বলুন তো তাজা ফুল কোনটা?

-হাশমা আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না! হেঁয়ালি ছেড়ে সরাসরি বলো!

-এটাও ধরতে পারলেন না। আমি হচ্ছি সেই তাজা ফুল!

-বাসি ফুল কোনটা?

-কেন আপনি?

-কেন কেন?

-এত খুলে বলতে পারব না। আপনিই নিজে নিজেই বুঝে নেবেন। একান্তই যদি বুঝতে না পারেন, তখন দেখা যাবে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

- আর হাঁ, আমাদের রাতযাপন কিন্তু এই ঘরে হবে না। আরেক জায়গায় হবে!
-কোথায়?
-দক্ষিণদিকে গিয়েছিলেন?
-হুঁ!
-সেখানে একটা তাঁবু টানানো হয়েছে! সেখানে। আমাদের বেদুইনরীতিতে নবযুগলরা প্রথম কয়েক রাত তাঁবুতেই কাটায়। আমরা সেখানেই যাব। আমিই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব!

***

আমীর ঘোরের মতোই হাশমার পিছু নিল। সে বুঝে উঠতে পারছিল কালো মেয়েটার মতিগতি। অন্য ধরনের এক অপার্থিব ভালো লাগা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাঝেমধ্যে অবশ্য চোরাকাঁটার মতো আরেকটা নিষ্পাপ মুখ ভেসে উঠছিল। মাথা ঝাড়া দিয়ে বারবার সেটা দূর করার চেষ্টা করছিল আমীর। তাঁবুতে পৌঁছেই আমীর বলল:
-হাশমা, আমরা কি একটু বাইরে হাঁটতে পারি?
-রাতের বেলা বাইরে বেরুনো নিরাপদ নয়। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে। তবুও চলুন! মরু অঞ্চলের চাঁদের আলো ভারি সুন্দর হয়। আর আফ্রিকার চাঁদ তো আরও বেশি সুন্দর!
-কেন?
-কী জানি! মানুষগুলো কালো বলে হয়তো!
-কেন? তুমি কালো বলে, নিজেকে খাটো মনে করো?
-উঁহু! মোটেও না। আমি কালো না ধলা এটা আমার মনেই থাকে না। শুধু আমার কেন, আমাদের কারোরই মনে থাকে না। চামড়ার রং নিয়ে বেশি ভাবিত থাকে শাদা চামড়ার লোকেরাই!
-আপনি কি জানেন, আমি একজন রাজকুমারী?
-কই না তো! সত্যি সত্যি তুমি 'প্রিন্সেস'?
-আপনার সাথে মিথ্যা বলতে যাব কোন দুঃখে?
-আমার খুবই অবাক লাগছে! জানতে ইচ্ছে করছে বিষয়টা?
-আমাদের সুদানে ইসলাম আগমন করেছিল তৃতীয় খলীফা উসমান রা.-এর খিলাফতকালে। প্রাচীনকাল থেকেই সুদান ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটা অঞ্চল। নীলনদের কারণেই এটা হয়েছে। সাধারণত সবাই জানে 'ফারাও' মানে মিসর। অথচ কয়েকশ বছর ধরে ফারাও ছিল সুদানের অধিবাসী। তাদের রং ছিল কালো। তারা ছিল কালো ফারাও।
-রানি ক্লিওপেট্রা তো কালো ছিল!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-জ্বি। সেই ফারাওরা সুদানে বসেই মিসর শাসন করেছেন। এখনো সেই ফারাওদের তৈরি করা অসংখ্য পিরামিড সুদানে আছে। তারা ছিলেন 'নুবীয়' বংশের। আমার আম্মা এই নুবীয় বংশের মেয়ে।
-ও এজন্যেই তুমি একজন 'প্রিন্সেস'?
-জি না। কথা শেষ হয়নি। নুবীয় বংশের রাজত্ব সেই কবে চুকেবুকে গেছে!
-তাহলে?
-ঘটনা আরও পরের! আমার একজন পূর্বপুরুষের নাম আহমাদ আলহামদী রহ.। আমাদের পারিবারিক ইতিহাস বলে, তিনি ছিলেন একজন সাইয়েদ!
-মানে আওলাদে রাসূল!
-জি। ইয়া আল্লাহ! এতবড় সৌভাগ্যও আমার কপালে ছিল?
-কেন কী হয়েছে?
-তুমি বুঝতে পারছ না? তোমার শরীরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রক্ত আছে?
-হতেও পারে আবার নাও পারে! নিজেদের অন্যদের কাছে সম্মানিত করে তোলার জন্যে অনেকেই বানিয়ে বানিয়ে নিজেদের সাইয়েদ বলে! অবশ্য আমাদের পরিবারে পূর্বপুরুষদের বংশলতিকা আছে! সেখানে আমাদের সাইয়েদ রূপেই দেখানো আছে!
-আচ্ছা! তোমার হাতটা একটু দেবে?
-কেন কেন? শুধু হাত দিয়ে কী হবে? পুরো আমিই তো হাজির?
-তোমার হাতে একটু চুমু খাব। স্ত্রী হিশেবে নয়, একজন আওলাদে রাসূল হিশেবে।
-এই নিন।
-তারপর?
-আমাদের বড় দাদা হযরত মাহদী স্বপ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছিলেন। নানাজান দাদাভাইকে স্বপ্নে হুকুম দিয়েছিলেন, তার এলাকার মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক দাওয়াত প্রচার করতে। সমাজ থেকে যাবতীয় বিদআত ও কুপ্রথা দূর করতে!
দাদাভাই সেমতে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন। দাওয়াত দিতে দিতে একসময় নিজের এলাকায় ইসলামী শাসনও কায়েম করেছিলেন। খার্তুমও তার অধীনে এসে গিয়েছিল। এখানে তিনি ইংরেজ শাসক চার্লস গর্ডনকে হত্যা করেছিলেন। উসমানী সালতানাতের বাহিনীকেও তিনি পরাজিত করেছিলেন। আব্বু অবশ্য বড় দাদার আদর্শকে ধরে রাখেননি।
-কেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-দাদুর চিন্তায় কিছু অস্বাভাবিকতা ছিল। যাকে আমরাবিদআত বলে থাকি। এজন্যে আব্বু তার বংশীয় তরীকা 'মাহদীবাদ'কে গ্রহণ করেননি। আব্বু অবশ্য আগাগোড়াই রাজনীতি থেকে দূরের মানুষ। সুদানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জা'ফর নুমাইরি (১৯৩০-২০০৯) আব্বুকে বেশ সম্মান করতেন। প্রেসিডেন্ট নুমাইরি যখন দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেন, আব্বুর সাথে পরামর্শ করতে এসেছিলেন। আচ্ছা, এখন এসব ইতিহাস থাক। সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে এসব নিয়ে বকবক করার!

-আমার কাছে ভালোই লাগছিল। ঠিক আছে, তোমার মর্জি।

-চলুন কূপের পাড়ে গিয়ে বসি! ওখানে বসে বসে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসি! আমার খুবই প্রিয় জায়গা। আমরা বাড়ি এলেই ওখানে বসে গল্প করি।

***

মায়ের পীড়াপীড়িতে আরও দুটো দিন এখানে থাকা হলো। বিয়ের পরপরই মেয়েকে কাছছাড়া করতে চাননি। এবার যাবার পালা। আগামীকাল সন্ধ্যায় জিপ আসবে। রাতেই আমরা রওয়ানা দেব। সবার মনে ভয় বাসা বেঁধে আছে। একান্ত পরিচিত কিছু সশস্ত্র মানুষও সাথে যাবে। পথে পথে আরও কিছু আত্মীয়-পরিবার আমাদের দিকে চোখ রাখবে! এত সতর্কতার পরও কেউ স্বস্তি পাচ্ছিল না। কারণ, এখানে বা আশেপাশে কিছু ঘটার আশঙ্কা নেই। সবচেয়ে ভয় হলো, জুবা শহরে প্রবেশের পর। সেখানেই খ্রিষ্টানপক্ষ বেশ শক্তিশালী!

আমরা রওয়ানা হলাম। সবাই বেশ অশ্রুসজল হয়ে বিদায় জানাল। আলিও আমাদের সাথে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি জোর করে তাকে আমাদের একদিন পরে আসতে বলেছি। গাড়ি রওয়ানা দিল। আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হাশমা আমার পাশেই বসা ছিল। নিরাপদ এলাকা পার হয়ে আসার পর, হাশমাকে পেছনে নিয়ে কম্বল পেঁচিয়ে লুকিয়ে রাখলাম।

***

রাতের বুক চিড়ে গাড়ি চলছে। দিনের আলো ফুটি ফুটি করছে, আমরা জুবার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলাম। ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই। ট্রেন পর্যন্ত যেতে পারলেই আর চিন্তা নেই। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছি। ট্রেন ধরতে হবে। দুশ্চিন্তা আস্তে আস্তে কমে আসতে শুরু করেছে। আমরা শহরে ঢোকার একটু আগেই হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে একটা জিপ এসে আমাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো, হয় গাড়িটাকে ধাক্কা দিতে হবে না হয় ব্রেক কষতে হবে। পেছনে হাশমা না থাকলে ভিন্ন কিছু চিন্তা করা যেত! বাধ্য হয়ে গাড়ি থামালাম! ওদিক কয়েকজন অস্ত্র উঁচিয়ে এদিকে দৌড়ে এল!আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পাশে বসা গাড়ির চালক থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। আমি সম্পূর্ণ অকম্প-স্থির হয়ে বসে রইলাম। একজন এসে শীতল গলায় বলল:

-আমরা আপনার কোনও ক্ষতি করতে চাই না! আমরা শুধু পেছনে যে আছে, তাকে নিয়ে যাব!

-আমার জীবন থাকতে সেটা সম্ভব নয়!

একথা বলেই আমি পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলাম। তারা সাথে সাথে অস্ত্র উঁচিয়ে বলল:

-শুধু শুধু প্রাণ কেন খোয়াবেন?

আমি কিছু বলার আগেই তারা আমাকে বেঁধে ফেলল! তারপর পেছন দিকে গেল। একটু পরেই গুলির প্রচণ্ড আওয়াজে আমাদের কানে তালা লাগার উপক্রম হলো! আমাকে এমনভাবে বেঁধেছে, পেছনে ফিরে তাকানোর উপায়ও ছিল না। আমার সাথে বসা চালককে তারা কিছু বলেনি। বাঁধেওনি। আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করল। মনে হলো আমি মরে গেছি। অসহ্য রাগে মোচড়ামোচড়ি করতে গিয়ে নাইলনের রশি হাত কেটে বসে গেল। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। আমি যতই চিৎকার করতে চাইলাম গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ ফুটল না। এভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলতে পারব না! গাড়ির পেছন থেকে চাপা গোঙানির আওয়াজ আর বাইরের একজনের গলা ফাটানো আর্তনাদে সংবিৎ ফিরে পেলাম! এরপরই চারদিক নীরব হয়ে গেল।

***

পাশে বসা চালক আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। আমি পাগলের মতো দৌড়ে পেছনে গেলাম। গাড়ির বাইরে কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। গাড়ির ভেতরে পড়ে আছে রক্তাক্ত হাশমা! চোখদুটো খোলা। হাতের রিভলবারটা দরজার সামনের দিকে নামানো অবস্থায় তাক করা! গাড়ির রড ধরে কোনওমতে নিজের পড়ে যাওয়া ঠেকালাম! কান্না আসছিল না। দুঃখ লাগছিল না। মাথায় কিছুই আসছিল না। কেমন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেতর দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছিল!

***

ট্রেন চলছিল আপন গতিতে। শোঁ শোঁ করে শীতল বাতাস আসছে শার্সি দিয়ে। অদূরে নীলনদ কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। হুশ করে একটা ছোট্ট স্টেশন পার হলো ট্রেন। উসমান মাহজুব অশ্রুসজল চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

***

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রেলভ্রমণ শেষে খার্তুমে ফিরে এল আমীর। মনটা আগের চেয়েও খারাপ। দীর্ঘ ভ্রমণ কষ্টকে দূর করতে পারেনি। ভাবছে লম্বা একটা ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্যে সুদানের বাইরে যাবে। নিজের অতীতের সন্ধানে। এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটাও কেন যেন দিনদিন মরে যাচ্ছে। আশ্চর্য একটা 'মানুষ' মাত্র কয়েকদিনে এভাবে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে? কী ছিল হাশমার মধ্যে? কালোমাণিকটার হৃদয়ে? আচরণে? ভীষণ সুন্দর চোখদুটোতে? তার খিলখিলে রিনরিনে হাসিতে? জীবনে আর কোনও নারীকে ভালো লাগবে, হাশমাকে বিয়ের আগে কল্পনাতেও আসেনি! একরাতেই কীভাবে চিন্তা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে? এ ভালোবাসা কি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে? যাকে কুরআনে 'মাওয়াদ্দাহ' বলা হয়েছে? অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আজ দুটি মুখ একসাথে ভেসে উঠছে মানসপটে! একটার ধাক্কা কোনওমতে সামাল দেয়া যায়, কিন্তু দুটো কীভাবে? আর একজন না হয় আল্লাহর কাছে চলে গেছে। আরেকজনের যে কোনও সংবাদই নেই। রীতিমতো নিরুদ্দেশ! মৃত্যুর সংবাদ পেলেও নিশ্চিন্ত মনে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যেত! মনের বিপদগুলো রাতের বেলাতেই কেন আসে?

***

আমীরের আজ অফ ডে। খার্তুমে ঈদের ছুটি চলছে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল! কিছুই ভালো লাগছিল না। না খেতে, না ঘুমুতে, না কোথাও যেতে। অনেকেই এসেছিল তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে। এককথায় না করে দিয়েছে। হাশমা বলেছিল এবার ঈদের ছুটিতে ওমরা করতে যাবে! সে থাকলে আজ মক্কায় থাকা হতো! মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক! আচ্ছা আলির সাথে একবার দেখা করতে গেলে কেমন হয়? ঈদের দিন থাকবে এখানে? বাড়ি চলে যাবে না তো! ফোন করে দেখা যাক! নাহ, সরাসরি গিয়ে উপস্থিত হই! থাকলে ভালো, নইলে বাইরের খোলা বাতাসের ছোঁয়ায় ঘরের গুমোট থেকে দূরে সরা যাবে।

আলির সাথে আর যোগাযোগ হয়নি। সে কি রাগ করেছে? আমার কি উচিত ছিল না, তার সাথে একবার দেখা করার বা কথা বলার? তার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করাও কি আমার উচিত ছিল না? সময়টাই আসলে অন্যরকম কেটেছে! উচিত-অনুচিত বোধও হারিয়ে গিয়েছিল! শরীরের যেমন কোমা থাকে, মনের বা চিন্তা-চেতনারও বোধ হয় 'কোমা' থাকে! আশেপাশে কোনও কিছুই তখন রেখাপাত করে না।

***

আমীর গাড়ি নিয়ে বের হলো। গন্তব্যে পৌঁছে দেখল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। যাক, বাড়ি যায়নি তাহলে! দরজা খুলে আলি রীতিমতো বাকহারা!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-কী ব্যাপার! এত অবাক হওয়ার কী আছে?

-না, আজব কাণ্ড! আমি তোমার কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম! আমরা আগামীকাল ওমরায় যাব! তুমি যাবে কি না, জানতে যাচ্ছিলাম! আম্মুর খুব ইচ্ছা, তোমাকে সাথে নেবেন!

-উনি কি এখানেই আছেন?

-জি, ভেতরে এসো!

-আমি বড় ভয়ে ভয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম আমার মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দেবে! আমি আগেই দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি!

-কেন? তুমি কোনও দোষ করোনি। তোমার কষ্টের কথা আমরা বুঝতে পেরেছি! আমাদের ভেঙে যাওয়া বুকের ব্যথাও নিশ্চয়ই টের পেয়েছ! শোকটা কাটিয়ে উঠতে সময়ের প্রয়োজন ছিল। হাশমা আমার বোন। তার মতো একটা মানুষ এভাবে ঝরে যাবে, মেনে নিতে ভীষণ কষ্ট হয় বৈকি! কত সম্ভাবনাময় ছিল সে! কী অফুরন্ত স্বপ্ন ছিল তার! সবই আল্লাহর ইচ্ছা!

-ওমরায় যাওয়ার কথা কী যেন বললে!

-ও হ্যাঁ, এটা ছিল হাশমারই পরিকল্পনা! তুমি তো জানোই! এজন্যে আম্মু বলেছিলেন, তোমাকেও সাথে নিতে!

শাশুড়িকে পেয়ে আমীরের পুরোনো ক্ষত আবার জেগে উঠল। কিন্তু মেয়ের শোকে মানুষটা গত কয়েকমাসে এমন হয়ে যাবেন, আমীর এতটা ভাবতে পারেনি। যেন একটা জীবন্ত কঙ্কাল! চোখদুটো কোটরাগত! কোনও মতে কয়েকটা কথা বলে, আমীর যেন পালিয়ে বাঁচল! আরেকটু থাকলে, সেও আবার শোকাক্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। যে চলে গেছে, তাকে ভোলা সম্ভব নয়। কিন্তু ভেঙে পড়লে উর্ধ্বতন মহলে জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। চায়নিজ দূতাবাসেও সংবাদটা চলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তখন হিতে বিপরীত হবে!

***

আলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেক দিন পর দু-বন্ধুতে বের হওয়া গেল। নীলের তীরে গিয়ে বসল। দুজনেই চুপচাপ! কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে নীল। নীলের দুইটা অংশ—শাদা আর নীল অংশ খার্তুমে এসে মিলিত হয়েছে। মোহনাটা বড়ই মনোমুগ্ধকর! আজ প্রকৃতি তেমন টানছে না। অনেকক্ষণ পর আলি অস্ফুটে বলল:

-তুমি কোনও দরকারে গিয়েছিলে আমার বাসায়?

-না,এমনিই দেখা করতে গিয়েছি! কিছুদিনের জন্যে সুদানের বাইরে যাব ভাবছি! তাই তোমাকে জানানোও উদ্দেশ্য ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-কোথায় যাবে? ওমরায় চলো আমাদের সাথে?

-এখনই ওমরায় যাওয়াটা বোধ হয় আমার জন্যে ঠিক হবে না!

-তাহলে কিছু ঠিক করেছ?

-এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি! তবে প্রথমে সাংহাই যাব! সেখান থেকে কাশগড় ! তারপর হয়তো তুরস্কে যেতে পারি! আফগানিস্তানে বা কাজাখাস্তানেও যাওয়া হতে পারে!

-বা রে! বেশ লম্বা সফর মনে হচ্ছে! শুধু ঘোরাঘুরিই উদ্দেশ্য নাকি অন্য কোনও কাজ আছে? আমাকে বলা যাবে? কিছুদিন পরে গেলে আমিও তোমার সঙ্গী হতে পারতাম!

-আমি যে কাজে যাচ্ছি, তাতে মানুষ যত কম হয় ততই ভালো! অন্তত চায়নাতে তোমাকে সাথে রাখা যাবে না। চোখে পড়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকবে!

-কী ধরনের কাজ?

-অনুসন্ধান! একজন হারানো মানুষের খোঁজে যাব!

-এত কষ্ট স্বীকার করে যখন যাচ্ছ, ধরে নিতে পারি, মানুষটা তোমার অতি আপনজন!

-তোমাকে বলা হয়নি! হাশমাকে বলেছিলাম! আমি আগে একবার বিয়ে করেছিলাম।

-জি, হাশমা আম্মুকে সেটা জানিয়েছে! আমি আম্মুর কাছে শুনেছি! তা হলে কি তোমার স্ত্রী জীবিত আছেন?

-সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই এই জীবনসফর! হারিয়ে যাওয়া জীবনের সন্ধানে এই অভিযাত্রা বলতে পারো! আগে জানতাম সে মারা গেছে! কিন্তু এখন কিছু কিছু সূত্র বলছে, তারা সে মারা যায়নি।

-আমাকে সবটা খুলে বলতে পারবে? আমি অন্তত ওমরায় গিয়ে দু'আ করতে পারব!

-আমার জীবনটা আসলে এক জটিল সমীকরণ! আমি জন্মেছি এক হুই মুসলিম পরিবারে! হুই মানে এরা দেখতে পুরোপুরি চায়নিজদের মতো। চীনের বেশির ভাগ মানুষই 'হান' গোষ্ঠীর। হুইদের পূর্বপুরুষরা এসেছিল পারস্য ও মধ্যএশিয়া অঞ্চল থেকে। এখানে এসে তারা বিয়ে করে 'হান' মেয়েদের। কালক্রমে হুইরা চেহারা-সুরতে পুরোপুরি হানদের মতো হয়ে গেছে। এদের বাস মূলত কানসু প্রদেশে! অন্য প্রদেশেও আছে। ধর্মের কারণে হুইদের ওঠাবসা বেশি হয় উইঘুর মুসলিমদের সাথে। বিয়েশাদিও হয়ে থাকে! তাই আমাকে দেখে কেউ ধরতে পারে না! আমি হুই না হান! সবাই মনে করে আমিও হান! খাঁটি চীনা!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

***

চীনে একটা আইন আছে: একসন্তান নীতি। ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে, কমিউনিস্ট পার্টি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল করতে, এই অমানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতি পরিবার একটা করে সন্তান গ্রহণ করতে পারবে! চীনে ১৯৭১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৩৩ কোটি ৬০ গর্ভপাত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এটা ছিল সরকারিভাবে নিবন্ধিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিসংখ্যান! এছাড়া সরকারি ভয়ে গোপনে গর্ভপাতের সংখ্যাও কম নয়।

মাও সেতুংয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধাক্কায় মারা গিয়েছিল লাখ লাখ মানুষ! কিন্তু 'একসন্তান নীতি' ছিল এর চেয়েও শতগুণ বেশি ভয়াবহ আর করুণ! তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনটা শিথিল করা হয়েছিল। জিনজিয়াং ও বিভিন্ন উপজাতিদের জন্যে একটু ছাড় ছিল। শহরবাসী উইঘুরদের জন্যে দু-সন্তান, গ্রামের লোকদের জন্যে তিন সন্তান আর কৃষক-পরিবারের জন্যে তিনের অধিক সন্তানগ্রহণের অনুমতি ছিল। হুইদের জন্যেও একই আইন বলবৎ ছিল। আমি ছিলাম পরিবারের তৃতীয় সন্তান! শহরের অধিবাসী হওয়াতে, সরকারি আইনে, আমার মৃত্যু ছিল অবধারিত! কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন!

***

জিনজিয়াংয়ে প্রাচীনকাল থেকেই উইঘুর মুসলমানরা বাস করে আসছে। এখানে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুংয়ের কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর, জিনজিয়াংকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, চীনের সাথে একীভূত হয়ে যেতে! উইঘুর নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মাও সেতুং তখন সেনা অভিযান চালিয়ে প্রদেশটা জবরদখল করে নেয়। সেই থেকেই এখানে স্বাধীনতা আন্দোলন চলে আসছে।

কমিউনিস্ট সরকার পাল্টা ব্যবস্থা হিশেবে অন্য প্রদেশ থেকে হানদের এনে পুনর্বাসিত করতে শুরু করে। বিশেষ করে রাজধানী উরুমুচিতে। এখানে বর্তমানে জনসংখ্যার ৫০% ভাগ হান। ব্যবসা-বাণিজ্যে হানদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য।

***

আমি গর্ভে আসার পর, আম্মু কিছুতেই সরকারি হাসপাতালে যেতে রাজি হলেন না। তিনি অনাগত সন্তানকে হারাতে রাজি নন। যা হওয়ার হবে! আব্বা পড়লেন বিপাকে! তার ব্যবসায়িক পার্টনার ছিলেন একজন 'হান'। তার কাছে সমস্যাটা খুলে বললেন। ভাগ্যক্রমে পার্টনার ছিলেন নিঃসন্তান। একটা সন্তান দত্তক নেয়ার কথাই ভাবছিলেন। উঁচু মহলে প্রভাব খাটিয়ে গর্ভে থাকতেই আমাকে বৈধভাবে দত্তক নিয়ে নিলেন। সবদিক রক্ষা হলো। আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পালক পিতামাতা হান হলেও মানুষ হিশেবে বড় ভালো ছিলেন। তারা আমাকে শতভাগ মুসলিম সন্তানের মতো না হলেও, মোটামুটি মুসলিম হিশেবেই লালনপালন করলেন। অবশ্য সরকারি নথিপত্রে আমার কোনও ধর্ম ছিল না।

আমি আসল মায়ের কাছেও যেতাম। তিনি বড় যত্ন করে আমাকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করতেন। এভাবেই বেড়ে উঠলাম! একটু বড় হওয়ার পর পালক আব্বু-আম্মুর সাথে সাংহাইতে চলে এলাম! এখানে এসে ধর্মের সাথে সম্পর্ক অনেকটাই ফিকে হয়ে যায়। চারপাশের পরিবেশের প্রভাবে আমিও আর দশজন চীনা যুবকের মতোই জীবনযাপন করতে লাগলাম। লেখাপড়া শেষ হলো। আমি একটা কারখানায় নবিশ হিশেবে যোগ দিলাম।

***

চীন সরকারের একটা কৌশল ছিল, তারা উইঘুর ছেলেমেয়েদের জবরদস্তিমূলক প্রদেশের বাইরে পাঠিয়ে দিত। এমন কৌশল অবলম্বন করা হতো, এরা যাতে আর জিনজিয়াংয়ে ফিরে যেতে না পারে। সাংহাইতেও নিয়মিত উইঘুর যুবক-যুবতীদের নিয়ে আসা হতো। আসতে না চাইলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো! বাঁচার উপায় ছিল না। এজুলুমের চাপ সহ্য করতে না পেরে, অনেক উইঘুর গোপনে দেশত্যাগে বাধ্য হতো। দীর্ঘ বিপৎসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে, পামির মালভূমি পেরিয়ে আফগানিস্তানে চলে যেত। উইঘুররা জাতিতে তুর্কিদের সহোদর। এজন্যে তুরস্কের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া হয়েছিল, উইঘুর নেতাদের পক্ষ থেকে। ১৯৬৫ সালে মরহুম আদনান মেন্দেরেস (১৮৯৯-১৯৬১)। এআবেদনে সাড়া দেন। অবশ্য আমেরিকা উইঘুর মুসলমানদের আলাস্কায় পুনর্বাসিত করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে সবার আগ্রহ ছিল তুরস্কের দিকে। দলে দলে উইঘুররা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তুরস্কে পাড়ি জমাতে শুরু করল!

***

আলি এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার মুখ খুলল:

-তোমার অন্য ভাই দুজনের কী খবর?

-তারা এখন কোথায় আছে জানি না! শুধু এটুকু জানি, তারা আফগানিস্তানে গিয়েছিল। সেখান থেকে গোপনে ফিরে এসেছিল! তবে ঘরে আসেনি। এলেও রাতের আঁধারে আম্মুর সাথে দেখা করে আবার গা ঢাকা দিয়ে চলে যেতেন! চায়নিজ সরকারের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় তাদের দুজনের নাম উঠে গিয়েছিল!

-তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, এমন কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ! এছাড়া তাদের হাতে অনেক চায়না সৈন্য নিহত হওয়ার গুজবও আছে! তারা ছিলেন আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়! আমার মনে হয়, আমার পালক পিতা আমাকে এসবের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্যেই সাংহাইতে চলে আসেন!

-সাংহাইতে আসার পর আর কখনো আপন মায়ের কাছে যাওনি?

-গিয়েছি! না গিয়ে থাকতে পারতাম না যে! একবার পালিয়েও গিয়েছি!

-আপন মায়ের জন্যে মন বেশি খারাপ লাগত বুঝি!

-মায়ের জন্যে খারাপ লাগা তো ছিলই! আমার এক খেলার সাথিও ছিল ওখানে! তাকে দেখার জন্যেও যেতাম!

-সে সাথি এখন কোথায়?

-তাকে খুঁজতেই তো এবারের অনিশ্চিত অভিযাত্রা!

-ও আচ্ছা! এতক্ষণে বুঝেছি! তার নাম কী? আগাগোড়া ঘটনাটা বলো তো!

-তার নাম কুলসুম! আমার খালাতো বোন। আমার খালা হুই হলেও, খালুজি ছিলেন খাস 'উইঘুর'! কুলসুমও হয়েছিল দেখতে শুনতে হুবহু 'ইউঘুর'! মাও সেতুং জিনজিয়াং দখল করার পর, খালুজিরা প্রচণ্ড বিরোধিতা করে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তুললেন। প্রকাশ্যে লালফৌজের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে, আত্মগোপনে চলে গেলেন। তখন তিনি ছাত্র। একবারে সদ্য কৈশোর পেরুনো তরুণ! দিনদিন তিনি চায়না কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূলে পরিণত হতে লাগলেন। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাবস্থাতেই বিয়ে করলেন। গোপনে গোপনে সংসারধর্মও চলতে লাগল। কিন্তু ছন্দপতন হলো! একজন টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে খালুজির অবস্থান বলে দিল। গভীর রাতে সেনা অভিযানে খালা-খালু দুজনেই মারা গেলেন। কুলসুম তখন একেবারে বাচ্চা! আম্মু বোনের মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। আমাকে কাছে রাখতে না পেরে, আম্মুর শূন্য বুকটা খাঁ-খাঁ করছিল, বোনঝিকে পেয়ে খালি বুকটা সামান্য হলেও ভরল!

***

পাশাপাশি না হলেও আমার পালক-পিতার বাসা আর মূল বাসা হাঁটার দূরত্বে ছিল! কুলসুমকে পেয়ে আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলাম। মাঝেমধ্যে তাকে নিয়ে আসতাম! আমার পালক মা'ও কুলসুমকে খুবই পছন্দ করতেন। বাবা-মা হারা মেয়েটাকে যে কেউই আদর করত! আর কুলসুমটা ছিলও আদর কুড়োনোর মতো! মিষ্টি চেহারা! শান্তশিষ্ট মিষ্টি স্বভাব! ভালো না লেগেই পারে না!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সে আমার অর্ধেক বয়েসী হলেও, বোঝাপড়াটা ছিল দারুণ! ভাই-বোনের চেয়েও অনেক বেশি কিছু! একস্কুলে পড়তাম! আসা-যাওয়া একসাথে! খেলাধুলা একসাথে! খেলাধুলার চেয়ে মাতব্বরিই বেশি চলত! তাকে পড়ানোর দায়িত্বও চাপত মাঝে মাঝে! গুরুগিরি করার ঝোঁকে তার গায়ে হাতও তুলতে হতো! এমনিতেই! কোনও কারণ ছাড়াই! আর কেউ তাকে মারা দূরের কথা, সামান্য চোখ পাকিয়ে কথাও বলত না! এতিম শিশু! আমার মাথায় কী ভূত যে চাপত! মনে হতো আমি যেভাবে চাই, তাকে সেভাবে চলতে হবে! বিন্দুমাত্র হেরফের হওয়া চলবে না!

কুলসুম খুবই ভালো ছাত্রী ছিল। আমার চেয়েও ভালো। অনেক ভালো। ওর বয়েস যখন দশ, তখন একদিন অবাক হয়ে বলেছিল:

-ভাইয়া, তুমি আমাকে শুধু শুধু মারো কেন?

এর আগে সে কখনো আমাকে প্রশ্ন করেনি। যা বলেছি বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা পেতে দিয়েছে! মুখ বুজে আমার আব্দার পালন করেছে। ফরমাশ করার সাথে সাথে তামিল করেছে। একগাদা পড়া চাপিয়ে দিলেও ঠিক ঠিক আদায় করেছে! এবার তার ব্যথাতুর কণ্ঠের প্রশ্ন শুনে মনটা কেমন করে উঠল! সত্যিই তো! আমি কেন তার মাথায় শুধু শুধু চাঁটি মারতে যাই! হাঁ, ব্যথা না পায় মতো করেই মারি, তবুও সেটা তার কাছে হয়তো কষ্টের মনে হয়! এতদিন ছোট ছিল, এখন হয়তো নিজের মর্যাদা বুঝতে শিখছে! ভাবতে শিখেছে! হয়তো অন্যকিছু!

***

এরপর থেকে তাকে আর ছোট্ট খুকিটি ভাবতে পারতাম না। তার স্বভাবেও আস্তে আস্তে ভারিক্কি ভাব আসতে শুরুকরল। ততদিনে আমাদের দুজনের প্রতিষ্ঠান আলাদা হয়ে গেছে! দেখা-সাক্ষাৎও কমে গেছে! তবে যোগাযোগ একদম বন্ধ হয়ে যায়নি। আমি গেলে সে আগের মতো উচ্ছ্বাসভরে কথা বলে না। কিন্তু আমাকে দেখলেই তার চেহারা ও চাহনিতে কেমন একটা আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়! মনে হয় অনেক দিনের কামনার একটা কিছু পেয়েছে সে! এটা বুঝতে আর ধরতে পেরেছি অনেক পরে! যখন তাকে হারিয়ে ফেলেছি, তখন অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাঙা চিত্র জোড়া দেয়ার পর! আমি ভেবেছিলাম সে খুবই উচ্ছল আর হইচই করা স্বভাবের হবে! আম্মুও তা-ই ভেবেছিলেন! কীভাবে যেন সবার ধারণাকে সে ভুল প্রমাণ করে, অন্তর্মুখী আর চাপা হয়ে পড়ল! কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই তার গভীর মমত্ববোধ আর স্পর্শকাতর অনুভূতির পরিচয় ফুটে উঠতে লাগল! অথচ বয়েস মাত্র দশ! ছোট্ট এক বালিকা! নিতান্ত নিষ্পাপ সরল এক মেয়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাকে পড়ানো বন্ধ হয়নি। আগের মতো বকাবকি নেই। সেও আগের মতো হুটোপুটি করে না। অহেতুক মিটিমিট হাসে না। দুষ্টুমি করে পড়া রেখে পালানোর ফন্দি আঁটে না। লুকিয়ে আমার জুতোজোড়া সরিয়ে রাখে না। জুতোগুলো কনকনে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে বরফ করে রাখে না। আগের মতো তেলাপোকা,মরা টিকটিকিও পকেটে বা মাথার ওপর রেখে দৌড়ে পালায় না। টেবিলের বইগুলো এলোমেলো করে রাখে না। এসাইনমেন্টের খাতা হিজিবিজি এঁকে নষ্ট করে রাখে না!

আগে যা করত এখন ঠিক তার উল্টোটা করে। এদিকে আমাদের সাংহাই যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল। প্রথম দিকে কিছু মনে হয়নি। মনে হয়েছে নতুন জায়গায় ভালো লাগবে। আনন্দে থাকা যাবে। প্রথম প্রথম ভালো লেগেও ছিল। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর আর ভালো লাগছিল না। ভালো না লাগলেও উপায় ছিল না। পড়াশোনার চাপে মানিয়ে নিতে হলো। যোগাযোগ করে এল। বড় কোনও ছুটি হলে উরুমুচিতে যাওয়া পড়ত। আমি বেড়াতে গেলে আম্মা কুলসুমসহ কাশগড় যেতেন। নানার বাড়ি সেখানে। আমিও থাকতাম!

পরের দিকে কুলসুম বড় হলো। পর্দা শুরু করল। চায়নাতে পর্দাপুশিদার প্রচলন খুবই কম। অল্প কিছু পরিবারেই পর্দাপ্রথাটা চালু আছে। আমার নানাদের পরিবার সে অল্পসংখ্যকের তালিকায় আছে। আমি সাংহাই থেকেবেড়াতে গেলে আগের মতো কুলসুমের সাথে দেখা হয় না। কথাও হয় না। শুধু প্রাথমিক সৌজন্য-বিনিময়! এর বেশি নয়। আমি তখন ধর্ম পালন থেকে দূরে! থাকি নাস্তিক-অজ্ঞেয়বাদী পরিবারে! পালক-পিতা মানুষ ভালো, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ-কনফুশীয় বা লাওৎসে, কোনও ধর্মেরই ধার ধারতেন না। আস্তে আস্তে উরুমুচিতে যাওয়া কমে আসতে লাগল! আব্বু-আম্মু মারা গেলেন! পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গেল। কুলসুম পাকাপাকিভাবে কাশগড়ে নানারবাড়িতে চলে গেল।

***

আমি যখন পড়াশোনার পাট চুকিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করলাম, তখন পালক-পিতা মারা গেলেন। কিছুদিন পর পালক-মাতাও মারা গেলেন। আমি বড্ড একা হয়ে গেলাম। উরুমুচির সাথে সম্পর্ক আগের মতো নেই। কাশগড়েও যাওয়া হয়নি বহুদিন! পৃথিবীটা একেবারে নির্মম বাস্তব হয়ে দেখা দিল! আপন বলতে কেউ নেই! কুলসুমের কথা মাঝে মাঝে কল্পনায় এলেও, বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। চাকরির প্রচণ্ড চাপ সবচিন্তা তাড়িয়ে দেয়। রাত হলেই আবার একা! নিঃসঙ্গ! উরুমচিতে সরকারি দমনপীড়ন শুরু হলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাশগড়ও নিপীড়নের আওতার বাইরে থাকল না। এদিকে আমি নানা কারণে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম! অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন! বিস্মৃত। আমি যে একজন মুসলমান সেটাই ভুলে গেলাম। তবে ধর্মবিরোধীও ছিলাম না! আসলে ধর্ম নিয়ে রাগ বা অনুরাগ কোনওটাই ছিল না।

***

চায়না সরকার, জিনজিয়াঙে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ঠেকানোর আগাম ব্যবস্থা হিশেবে মুসলিম যুবক-যুবতীদের সেখান থেকে সরিয়ে ফেলত। দূরে হান-অধ্যুষিত কোনও প্রদেশে জোরপূর্বক চাকরি করতে পাঠাত। আমি যে কারখানায় কাজ করতাম, সেখানেই বহু ইউঘুর-হুই শ্রমিক ছিল। প্রতিবছর নতুন নতুন কর্মী আমদানি করা হয়। এবারও আনা হবে। প্রতিবার যারা আসবে, তাদের তালিকা আগেই প্রস্তুত করে রাখা হয়। কর্মস্থলে তালিকাটা পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমার দায়িত্ব ছিল এদিকটা তদারক করা। যারা আসবে তাদের আবাসন থেকে শুরু করে কাজের ধরন—সবই ঠিক করা। তাদের গতিবিধির ওপর রিপোর্ট তৈরি করা। পাশাপাশি কারিগরি দিকটা ধরিয়ে দেয়া। এবারের তালিকাটার ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে একটা নামে এসে থমকে গেলাম! কুলসুম! ঠিকানাও মিল আছে! বাবার নামও এক! এতদিন ভুলে থাকা একটা অধ্যায় সাথে সাথে খুলে গেল! এক লহমায় চলে গেলাম উরুমুচির সেই দিনগুলোতে! অনুতাপ-লজ্জা মর্মপীড়া সব একসাথে এসে জড়ো হলো! হায় হায়, আমি কী নিষ্ঠুর! এতদিন হয়ে গেল, একবারও খোঁজ নিলাম না! কুলসুম কেমন আছে, কোথায় আছে, কীভাবে আছে?

***

মনটা ছুটে গেল! ভাবলাম একবার ফোন করে দেখি! নাহ, সরাসরি চলে যাই। কুলসুম এখানে আসার আগেই! মামা আছেন, তার সাথেও দেখা হয়ে যাবে। সেদিনই কাশগড়ের ফ্লাইটে চড়ে বসলাম! বিমান থেকে নেমে মামার দোকানে গেলাম। মামা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি! প্রায় উড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন! চোখটা ভিজে উঠল! আমার দুনিয়া ছিল কাশগড়ে আর আমি কোথায় সাংহাইতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরছি! এত মায়া যে কাশগড়ে আমার জন্যে জমা হয়ে ছিল, কল্পনাও করতে পারিনি। মামা ছোট মানুষের মতো হাত ধরেবাড়িতে নিয়ে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে সবার খোঁজ নিলাম! একফাঁকে কেন এসেছি সেটাও জানালাম! মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন:

-মেয়েটাকে বোধহয় আর রক্ষা করতে পারলাম না! এত আগলে রেখেও কাজ হলো না! একটা মানুষ কখনো ঘর থেকে বের হয় না, কারও সাথে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেখা দেয় না, সে কীভাবে সরকারের জন্যে হুমকি হবে?
ভাগ্নে! আমার মনে হয় আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে পাঠিয়েছেন! তুমি একটা বুদ্ধি দাও তো! কী করা যায়? বাবা-মা নেই, তোমার মায়ের কাছে মানুষ, সেও চলে গেল! আমার কাছে এল! এখন এই উটকো পরিস্থিতিতে আমার নিজেরই অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি লেগে গেছে! কুলসুমকে যদি না পাঠাই, তা হলে আমার ঘরবাড়ি, দোকানপাট সব যাবে! যায় যাক, তাতেও যদি মেয়েটার ইজ্জত রক্ষা করা যেত! জানোই তো, যাদের 'ওয়ার্ক স্কোয়াডে' পাঠানো হয়, তারা আর উইঘুর থাকে না! তাদের মগজ ধোলাই হয়। চরিত্র লুণ্ঠিত হয়। এসব থেকে বাঁচতে বেশ কয়েকবার কুলসুমকে বিয়ে দিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি! ভালো ভালো পাত্র ছিল। এমনকি তুরস্কে থাকে, আমেরিকায় থাকে, এমন পাত্রও পেয়েছিলাম! তারা একজন খাঁটি উইঘুর মেয়ে বিয়ে করতে চায়! কিন্তু কুলসুমের এক রা, কিছুতেই বিয়ে করবে না। কেন করবে না, সেটাও বলে না! গোঁ ধরে আছে, বিয়ে করবে না! মরে গেলেও না! একটা পাত্র খুব বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। পিছু ছাড়ছে না। পাত্রটা তুরস্কে থাকে। সেই ষাটের দশকে এখান থেকে তাদের পরিবার চলে গিয়েছিল। ছেলেটার দাদি মৃত্যুর আগে ওসীয়ত করে গেছে, নাতি যেন একজন উইঘুর এতিম মেয়েকে ঘরনি করে আনে! বিশ্বাস করতে পারো, সে ইস্তাম্বুল থেকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছে বিয়ে করতে! দাদির ওসীয়ত মানতে!
এদিকে কুলসুমকে বোঝানো যাচ্ছে না! সে যে কেন মত দিচ্ছে না, রাজি হচ্ছে না, তোমার মামি অনেক চেষ্টা করেও বের করতে পারেনি! বিয়েটা হয়ে গেলে, কুলসুম স্বামীর সাথে তুরস্কে চলে যেতে পারবে! আর চিন্তা করতে হবে না! তুমি একটু বুঝিয়ে দেখো তো! তোমার কথা শুনবে মনে হয়!

***

কথা বলতে বলতে ঘরে পৌঁছে গেলাম। ঘরটার সাথে কত কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে, মায়ের স্মৃতি, নানা-নানুর স্মৃতি, ছেলেবেলার স্মৃতি, আমি কীভাবে ভুলে ছিলাম! মামা ভেতরে গিয়েছিলেন। একটু পর এসে বললেন:
-কুলসুম তোমার কথা শুনেই রেগে গেছে! কিছুতেই আসতে চাচ্ছিল না! জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি! সে কাঁদছে। তুমি একটু সান্ত্বনা দাও! আমি দোকানে যাচ্ছি, একটু পরেই চলে আসব। অনেক কথা আছে। পরামর্শ আছে।
পর্দার ওপাশ থেকে কুলসুম সালাম দিয়ে বলল:
-আমাদের কথা মনে আছে তাহলে?
-কেমন আছ সেটা বলো আগে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-আমাদের থাকা না-থাকা দিয়ে আপনি কী করবেন? আমরা বাঁচলেই কী মরলেই কী! তাতে আপনার কিছু যায়-আসে? আমরা আপনার কে?

-তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। আমি দুঃখিত। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার ওখানের আব্বু-আম্মু মারা গেছেন। অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে।

-সেসব কি আমাদের জানানো যেত না! আর কিছু না পারলেও পাশে থেকে দু-ফোটা চোখের পানি হলেও ফেলতে পারতাম। উনি তো আমারও মায়ের মতো ছিলেন। সাংহাই চলে যাওয়ার আগে আমাকে কত আদর করেছেন। আমি এতিম বলে আমাকে আপনি কখনোই পাত্তা দেননি। আমার জীবনটাই ভাসমান। একবার এখানে আরেকবার ওখানে। খালা মারা যাওয়ার পর ভেবেছিলাম আপনি খোঁজ-খবর রাখবেন। সে আশার গুড়ে বালি। এক-দু-দিনের কথা? বছরকে বছর পার হয়ে গেছে! একটা ফোন করেও কেউ অসহায় মেয়েটার খোঁজ-খবর করল না। মানুষ এমন পাথরও হতে পারে।

আমি কুলসুমের কথা শুনে থমকে গেলাম। মেয়েটার কথা থেকে যে ভিন্ন সুর বেরুচ্ছে! সে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। মামাও বলে গেলেন, আমি কিছু বললে সে শুনবে। কিছু ইঙ্গিত করে কথাটা বলেছেন? অথচ আমি কুলসুমকে একজন ছোট বোনই দেখে এসেছি! সময়ের সাথে সাথে চিন্তার পবিরর্তন ঘটে। কুলসুম কি বুঝ হওয়ার পর থেকেই এভাবে ভেবে এসেছে? হতে পারে। তা হলে তার অনেক আচরণের ব্যাখ্যা মেলে। এজন্যেই কি আমি তার সাথে একটু রাগ করে কথা বললেই, সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিত? আমার সাথে সব সময় দুষ্টুমিগুলো করত? আমি কী বোকা! বিষয়টা আগে বুঝতে পারিনি কেন?

কিন্তু আমার কোনও আচরণ বা কথায় আমি তার প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করিনি! তবুও তার মনে দুর্বলতা জন্মানোর কারণ কী? পড়াশোনা দেখিয়ে গিয়েছি! একসাথে ঘুরেছি! খেলেছি! কিন্তু বড় হওয়ার পর থেকে দুজনের আর দেখাই তো হয়নি! কথাও হয়নি বললেই হয়! কোন ফাঁকে বোকা মেয়েটা ডুবেছে! এখন আমাকেও ডোবাবে।

-কুলসুম, সত্যি বলতে কি, তুমি এভাবে চিন্তা করবে, ধারণাও করতে পারিনি! আমার ভুল হয়ে গেছে।

-আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।আমাকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না। আপনি বড় বেশি স্বার্থপর।

-না না, কুলসুম! তুমি ভুল বুঝছ। আমি অন্য কিছু বোঝাতে চাইনি।

-থাক আর বোঝাতে হবে না। আমি কারও গলার কাঁটা হতে চাই না।

কুলসুম রাগ করে উঠে চলে গেল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

***

রাতে মামার সাথে খাবার খেতে বসলাম। মামা কোনও ভূমিকা ছাড়াই প্রস্তাব দিলেন:

-তোমার মামি বলছিল, কুলসুমের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে তোমার অপেক্ষাতেই এতদিন বসে ছিল। তোমার সাথে কথা বলে আসার পর থেকেই নাকি কাঁদছে! তুমি কী বলো?

-আমি আসলে এমন কিছু কল্পনাও করিনি! তার সাথে কথা বলার পর থেকে ভাবছি আর ভাবছি। কোনও কূল-কিনারা করতে পারছি না। আপনি কী বলেন মামা, আপনিই এখন আমার একমাত্র জীবিত মুরুব্বি! আপনি যা বলবেন, মেনে নেব।

-আমি বলি কি, তুমি কুলসুমকে বিয়ে করো। মেয়েটা মনেপ্রাণে তোমার সাথে জীবন কাটাতে চাইছে।

-মামা, আপনার মুখের কথাই আমার জন্যে আদেশ।

***

আলি বলল:

-কতদিন তোমরা যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ছিলে?

-পাঁচ-ছয় বছর হবে।

-বাব্বাহ! এতদিন পরও সে আশায় আশায় বুক বেঁধে ছিল?

-আমিও এটা ভেবে ভীষণ অবাক হয়েছি! সে কিসের আশায় আমার প্রতীক্ষায় বসে ছিল? আবার আমিও কেন তার নামটা তালিকায় দেখে পাগলের মতো ছুটে গেলাম? আমার মধ্যেও কি কিছু একটা লুকিয়ে ছিল? নাকি এটা ছেলেবেলার স্মৃতির তাড়না? নাকি একটি এতিম মেয়েকে বাঁচানোর তাকিদ? কেন এলাম?

-আমার মনে হয় কি, তোমার মধ্যেও চাপা ভালোলাগা ছিল। তুমি টের পাওনি। জীবনের সুন্দরতম সময়টা কাটিয়েছ যার সাথে, যে ছিল তোমার একমাত্র খেলার সাথি, তার প্রতি মনের গহিনে কিছু একটা জন্ম নেয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আবার তার সাথেই তোমার আপন মায়ের অসংখ্য স্মৃতি জড়িত! তার কথা, তার স্মৃতি, তার সঙ্গ পেলেই তোমার হাজারো মধুমাখা হারানো দিন ফিরে আসবে!

-কিন্তু আলি, আমি সাংহাইতে থেকে থেকে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম! কুলসুমের মতো অতি রক্ষণশীল মেয়েকে আমার ভালো লাগার কথা নয়।

-তোমার অন্যরকম হয়ে যাওয়াটা ছিল বাইরে বাইরে! ভেতরে ভেতরে তুমি ঠিকই আগের 'আমীর' রয়ে গিয়েছিলে। আর ছেলেবেলার ভালোলাগাকোনও বাছবিছার মানে না। রক্ষণ-ত আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com আরেকটা ব্যাপারও লক্ষণীয়,

তোমাদের মধ্যে যোগাযোগটা অবাধ ছিল না। পর্দার একটা বাধা ছিল। তাই ভেতরের ভালোলাগাটুকু গাঢ় হয়ে বসার সুযোগ পেয়েছে। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এখন থাকুক, তারপর কী হলো সেটা বলো!

-মামা-মামির কথায় সম্মতি তো দিয়ে দিলাম! সমস্যা এল কুলসুমের পক্ষ থেকে। সে বিয়েতে রাজি নয়। মামা-মামি অবাক! তারা ভেবেছিলেন, আমিই কুলসুমের আরাধ্য পাত্র। আমিও প্রথমে খানিকটা বিস্মিত হয়েছিলাম। পরে ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম। মামার সাথেও কথা বললাম। সিদ্ধান্ত হলো, আমি কুলসুমের সাথে সরাসরি কথা বলব! তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব! তারপর যা হওয়ার হবে!

মামাকে নিয়ে কুলসুমসহ বসলাম। কুলসুম আগের মতোই অনীহা জানাল। মামা তার কাছে কারণ জানতে চাইল! প্রথম প্রথম না না করলেও, পরে মুখ খুলতে বাধ্য হলো। সে জানাল,

-আমি বিয়ে করলে কয়েকটা সমস্যা দেখা দেবে। তাছাড়া স্বামীর হক সে পুরোপুরি আদায় করতে পারবে না!

-কেন হক আদায় করতে পারবি না? আর এবিয়েতে কী সমস্যা দেখছিস?

-মামা, এখানে বিয়ে হওয়া আমার জন্যে যে কতটা আরাধ্য, সেটা বলে বোঝানো অসম্ভব!

-তাহলে?

-বিয়েটা হলে আমীর ভাইয়া বিপদে পড়বেন! দ্বিতীয়ত আপনি আর মামিও বিপদে পড়বেন। আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য হুমকির সম্মুখীন হবে! আর..!!

-আর কী?

-আমি একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছি! বিয়ে হলেও স্বামী-সংসারে সময় দিতে পারব না!

-কী এমন কাজ, তোকে ঘর-সংসার ছাড়তে হবে?

-সেটা মামা আমি তোমাকে বলতে পারব না! তোমার নিরাপত্তার খাতিরেই!

-ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, তুই কি আমীরের ভাইদের দলে যোগ দিয়েছিস?

-জি।

-ওরা কি তোকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছে?

-জি না! তারা তাড়াতাড়ি তাদের একজনকে বিয়ে করে নিতে বলেছে! নইলে পর্দা-পুশিদা ঠিক রেখে মেহনত করা যাবে না। কাজে বাধা সৃষ্টি হবে!

-তাহলে ওদের কারও সাথে তোর বিয়ে ঠিক হয়েছে?

-হয়েছিল! আমি না করে দিয়েছি!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-কেন?
-কেনর কারণটা আমিও খুঁজে পাচ্ছি না! আর কাউকে স্বামী হিশেবে কল্পনা করতে কষ্ট লাগে!
-আর কাউকে মানে? আমীর ছাড়া অন্য কাউকে?
-জি।
-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে এত দ্বিধা থাকলে চলে রে? বড় মুশকিলে ফেললি বেটি! ঠিক আছে, আমি বাজারে যাচ্ছি! তোরা কথা বলে একটা সিদ্ধান্তে আয়! আমিই এখন তোর বাবা, তোর মামিই তোর মা! আমরা তোর অকল্যাণ চাই না! তোর অমতে কিছু করতেও চাই না! তোর কষ্ট হয় এমন কিছু আমরা জীবন গেলেও করব না!

***

মামা উঠে যাওয়ার পর, কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। কুলসুম অনুমতি নিয়ে ভেতরে গেল। সাথে করে ছোট মামাতো বোনকে নিয়ে এল। এসেই বলল:
-আপনি কি সত্যি সত্যি এবিয়েতে রাজি? নাকি একটা অসহায় মেয়েকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে মনের তাকিদে বিয়ে করছেন?
-সত্যি কথা বলতে কি কুলসুম! এখানে আসার আগে তোমাকে বিয়ে করব, এমন চিন্তা আমার মাথায় ঘুণাক্ষরেও ঠাঁই পায়নি। আগেও কখনো তোমাকে জীবনসঙ্গী হিশেবে কল্পনা করিনি!
-আপনি অনেক বড়লোক! অনেক শিক্ষিত! আমার মত গরিব অসহায় এতিমকে আপনার ভালো লাগবে কেন!
-ধেৎ! রাখো তোমার এসব মেয়েলি কথাবার্তা! কী বলছি শোনো!
-এই তো, আগের মতো ধমকাধমকি শুরু করলেন!
-ধমক খাওয়ার মতো কথা বললে, ধমকাব না তো কী আদর করব?

***

আমার কথাটা শুনে কুলসুম ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে একটু থমকে গেলাম! সামলে নিয়ে বললাম,
-আমার কয়েকটা প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দাও!
-আমি এখানে কেন এসেছি?
-মামা-মামিকে দেখতে!
-আবারও বাঁকা পথে যাচ্ছ! ওয়ার্কলিস্টে কার নাম ছিল?
-আমার নাম!
-তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছ, তোমার নাম দেখেই আমি পাগলের মতো ছুটে এসেছি।
-জি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-আমার সম্পর্কে, আমার মনোভাব সম্পর্কে তোমার মনে আর কোনও খটকা আছে?
-জি না।
-আমাদের বিয়ে হতে আর কোনও আপত্তি আছে?
-ছোট্ট দুটো আপত্তি আছে।
-প্রথম আপত্তি, আপনি ধর্মকর্ম পালন করেন না! নামায পড়েন না! জেনেশুনে একজন বেনামাযীকে বিয়ে করাকে শরীয়ত অনুমোদন করে না।
-তোমাকে সাথে পেলে, আমি আর বেনামাযী থাকব না! দ্বিতীয় আপত্তি?
-আমি যে একটা দলে নাম লিখিয়েছি! তার কী হবে?
-বিয়ের পরও যদি তোমার মনে হয়, সেই দলের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়াটা তোমার ঈমানী দায়িত্ব, তা হলে আমি বাধা দেবো না।
-এটা কেমন কথা হলো, স্বামী একখানে আর স্ত্রী আরেকখানে?
-যদি বলি দুজনেই একখানে থাকব?
-আলহামদুলিল্লাহ! আমার আর কোনও খটকা নেই!
-তবে একটা ব্যাপার...!
-কোন ব্যাপার?
-বিয়ের পর, আমাকে কয়েকটা মাস সময় দিতে হবে! সবদিক গুছিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসার জন্যে!
-ইনশাআল্লাহ!

***

আলি মিটিমিটি হাসছে পাশাপাশি চোখও মুছছে! আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম,
-কী হলো? মুখে হাসি চোখে কান্না?
-কেন যেন হাশমার কথা মনে পড়ে গেল! বোনটা আমার বড় ভালো ছিল, তুমি কী বলো আমীর?
-ভাই রে! তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? আমি শুধু এটুকু বুঝি, আমি তার যোগ্য ছিলাম না! হাশমার মতো মানুষ আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এটা আমার জীবনের জন্যে অনেক বড় এক সনদ!
-কেন নিজেকে অত ছোট ভাবছ! তুমি সেদিন এগিয়ে না এলে, আমরা যে কী অকূলপাথারে পড়তাম! আমরা আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব! বোনটার হায়াত ছিল না, আল্লাহ তাকে কাছে তুলে নিয়েছেন! তবে কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার এই কুলসুমও এক অসাধারণ মেয়ে! দ্বীনের জন্যে জীবন দেয়ার মিছিলে যে নিজেই উদ্যোগী হতে পারে, এমনকি সারাজীবনের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাঙ্ক্ষিত মানুষটাকেও ত্যাগ করার সাহস দেখাতে পারে, তাকে যে সে মেয়ে বলা যায় না।

-তুমি ঠিক বলেছ! কুলসুম যে কীভাবে এতটা আত্মশক্তির অধিকারী হলো, ভেবে কূল পাই না! তার সাথে ঘর করেছি মোটে কয়েক দিন। প্রতিটি মুহূর্তে সে আমাকে নতুন নতুন চমক উপহার দিয়েছে! তোমার কাছে এসব বলা ঠিক নয়! তার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে, হাশমার আগে! আজ হয়তো দুজনেই বেঁচে নেই!

-বিয়ের আয়োজন কি সেই রাতেই হয়েছিল?

-জি, অত দেরি নয়, আমাদের আলাপ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মামা বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, বলা যায় না, মেয়েটার মতিগতি আবার কখন পাল্টে যায়! তবে গোপন ওলীমা হয়েছিল দু-দিন পর! কুলসুমের যুক্তি হলো, দেখা যখন হলোই, আর একটা মুহূর্তও বিচ্ছিন্ন থাকতে চাই না! প্রতিটি লগনকে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে রাখতে চাই! কুলসুম আরও বলেছিল, আপনাকে কিছু জায়গায় নিয়ে যাব, সেখানে যাওয়ার আগে বিয়ে করা জরুরি! নইলে আপনাকে প্রবেশ করতে দেবে না!

***

কুলসুম আমাকে তাদের গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়েছিল! ওরে বাবা, সেকী নিরাপত্তা! আমাকে আগেই বলে দেয়া হয়েছিল, আমি যেন প্রস্তুত হয়ে থাকি! গভীর রাতে কেউ আমাকে নিতে আসবে! আমার চোখ বেঁধে আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানকার আমীর সাহেবের সাথে দীর্ঘ আলাপ হলো! কুলসুমের ছাড়পত্রের কারণে আমি এমন নিশ্ছিদ্র গোপন স্থানে যেতে পেরেছি! এটা জানালেন। আমাকে প্রশ্ন করা হলো, আমি কি বাইয়াহ দিতে রাজি? কুলসুম বাইয়াহ সম্পর্কে বিস্তারিত বলে রেখেছিল! আমি নির্দ্বিধায় বাইয়াত দিলাম!

-কিসের বাইয়াত?

-বাইয়াত আলাশ শাহাদাহ! চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাইয়াহ!

***

কুলসুমকে নিয়ে বেড়াতে গেছি বিভিন্ন স্থানে। অবশ্য যেতে হয়েছে লুকিয়ে লুকিয়ে! বেড়াতে যাওয়ার পেছনে আমার উৎসাহই বেশি কাজ করেছিল! সারাদিন ঘরে বসে থেকে কী করব! আর আমার প্রয়োজন ছিল কথা বলার! দীর্ঘ আলাপের! ঘরে থেকে সেটা সম্ভব ছিল না! আমি একটানা কুলসুমের সাথে কথা বলে গেছি! নানা বিষয়ে! বিভিন্ন প্রসঙ্গে! বেশির ভাগ সময়েই আমি প্রশ্ন করেছি, সে উত্তর দিয়ে গেছে! ক্লান্তিহীনভাবে! যত সময় গড়িয়েছে, আমার অবাক হওয়ার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে! চীনের ইতিহাস,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উইঘুরদের ইতিহাস, তুর্কি জাতির ইতিহাস, পুরো ইসলামের ইতিহাস তার নখদর্পণে।

ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি যুদ্ধের বিস্তারিত তথ্যই শুধু তার জানা ছিল এমন নয়, প্রতিটি যুদ্ধে কোন কোন কৌশলে সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল, তারও ব্যাখ্যাসহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তার কাছে ছিল। খালিদ বিন ওয়ালির রা.-এর প্রতিটি যুদ্ধই তার মাথায় হাতের তালুর মতো পরিষ্কার ছিল। কোন যুদ্ধে তিনি কোন কৌশল কেন গ্রহণ করেছেন, তারও যথার্থ ব্যাখ্যা কুলসুম আমাকে শুনিয়েছে।

-তুমি এতকিছু কীভাবে জানলে? কোথায় জানলে?

-আফগান ও চেচনিয়া ফেরত ভাইদের কাছে! আমাদের মাদরাসায় নিয়মিত এসব পড়ানো হয়! বেশ ক'জন আরব ভাইও এসেছেন! তারাও নিয়মিত ক্লাস নেন!

-তোমাদের মাদরাসা? সেটা কোথায়?

-সেদিন আপনাকে নিয়ে গেলাম না? সেটাও একটা মাদরাসা! এছাড়া আরও বিভিন্ন স্পটে মাদরাসা আছে! এসব মাদরাসার ক্লাস সাধারণত রাতের বেলা হয়। মাটির নিচে! একপাশে স্বামীরা থাকেন! পাশের আরেক কামরায় স্ত্রী-কন্যারা। কঠোরভাবে পর্দা রক্ষা করা হয়!

-কী কী পড়ানো হয়?

-অনেক কিছুই! কুরআন কারীম! হাদীস শরীফ! সীরাত! আকীদা! ফিকহ! ইসলামের ইতিহাস! বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন যুদ্ধের কৌশল! ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা! চীনে খিলাফাহ কায়েম হলে, সম্ভাব্য কী কী বাধা আসতে পারে, তার প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী, শত্রুরা চারদিকে থেকে ঘিরে ফেললে একনাগাড়ে বোমাবর্ষণ করতে থাকলে, আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কী হবে, ইত্যাদিসহ আরও নানা বিষয় আমাদের ক্লাসে আলোচিত হয়।

-সবাই এসব বোঝে?

-কেন বুঝবে না? বারবার এসব আলোচনা করা হয়! পরীক্ষা নেয়া হয়! পরীক্ষায় পাশ না করলে, ময়দানে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। বারবার ফেল করলেও শরম! ছোটরা এগিয়ে যাচ্ছে! সুতরাং অলসতা করার সুযোগ নেই! অলসতা আসেও না! সবাই খুবই উৎসাহের সাথে পড়াশোনা করে! আর যারা পড়ান, তারা খুবই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পড়ান! ধীরে ধীর! বুঝিয়ে বুঝিয়ে! উদাহরণ দিয়ে দিয়ে! বিশেষ করে যারা পড়ান, তারা নিজ নিজ বিষয়ে এত পারদর্শী, আমাদের ধাঁধা লেগে যেত!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-তোমাকে দেখেই তা বুঝতে পারছি, কেমন পড়াশোনা হয়! আচ্ছা, কুলসুম!

-হুঁ

-একটা কথা বলো তো, তুমি বিয়ে না করে, এতদিন কেন দেরি করলে?

-আমার ইচ্ছে!

-একটু বলো না, বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে!

-এখন জেনে কী করবেন?

-তুমি কি জানতে, আমি কখনো আসব?

-হুঁ!

-কীভাবে এতটা নিশ্চিত হয়ে ছিলে! আমার সাথে তোমার কোনও যোগাযোগই তো ছিল না! আর এবিষয়ে আমাদের দুজনের কখনো কথাও হয়নি! তাহলে?

-আমি ছোটবেলা থেকে একটা দু'আ করে এসেছি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আটা কবুল করবেন! আমি একবার স্বপ্নে দেখেছি, দুজনে একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করছি!

-সুবহানাল্লাহ! তুমি এমন একটা রত্ন, আরও আগে যদি জানতে পারতাম!

-জানতে পারলে কী করতেন?

-কী করতাম! কী করতাম? তাই তো, কী করতাম? ও হাঁ, সাংহাই ছেড়েছুড়ে তোমার কাছে চলে আসতাম!

-এসেছেন তো!

আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল। কুলসুমকে বলে চলে এলাম সাংহাইতে। অনেক কাজ জমে গেছে! দিনরাত ডুবে থেকেও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। তৃতীয় দিন খবর পেলাম, সরকার কঠোর সামরিক অভিযান চালিয়েছে কাশগড়ে। মামার দোকানপাট সব ভেঙে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। ঘরবাড়িও অক্ষত নেই। শুধু মামার বাড়িই নয়, পাড়া-প্রতিবেশী সবার! পুরো এলাকাজুড়েই ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। ঘনিষ্ঠজনেরা আমাকে সেখানে যেতে নিষেধ করল! অসহায় হয়ে আঙুল কামড়ানো ছাড়া কিছু করার ছিল না।

***

অনেক দিন কেটে গেল। কোনও খোঁজ-খবর বের করতে পারলাম না! গোপনে অনেককে পাঠিয়েছি! ফলোদয় হয়নি। বিচ্ছিন্ন একটা সূত্রে খবর পেয়েছি, তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে। আরেক সূত্র বলেছে, সবাই সরকারি আক্রমণে শহীদ হয়েছেন! তারপর চীনে থাকতে আর ভালো লাগল না! বাইয়াতের কথা ভুলে গেলাম! চাকরি নিয়ে সুদানে চলে এলাম!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-এখন তুরস্কে গিয়ে কী করবে?

-একলোক বলেছে, আমার মামার মতো একজনকে আঙ্কারায় দেখেছে! তাই শেষচেষ্টা হিশেবে তুরস্কে খোঁজ নিয়ে দেখি! তুমিও চলো আমার সাথে! আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি! চলো, ভালো লাগবে!

***

তুরস্কে এসেছি গতকাল! তুরস্কে তিন লক্ষেরও অধিক উইঘুর আছে তারা আঙ্কারা ইস্তাম্বুল ও কায়সারিতে বাস করে। কোথায় খুঁজি তারে? আগে উইঘুর কল্যাণ পরিষদে গিয়ে খোঁজ করা যেতে পারে। এই পরিষদ গঠিত হয়েছে ২০০৬ সালে। প্রবাসী উইঘুরদের সুবিধা-অসুবিধা দেখে। উইঘুরসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করে। আজ যাওয়া যাবে না, আজ ১২ নভেম্বর! ১২ নভেম্বর প্রবাসী উইঘুররা পূর্ব তুর্কিস্তান প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। এই তারিখে উইঘুররা দুইবার স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে ও ১৯৪৪ সালে। অনুষ্ঠানে গিয়ে আমরা অবাক! অনেক অনুষ্ঠানই কুর্দিস্তানের অনুষ্ঠানের মতো। ইসলামের কোনও নামগন্ধ নেই! পুরোই জাতীয়তাবাদী ধাঁচে নাচ-গান সবই চলছে! ধর্মের প্রলেপও আছে! মিলাদ-মাহফিল হয়েছে! ফাঁকে ফাঁকে চীন সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য! চায়না সরকার কুরআন পড়তে বাধা দেয়। হিজাব পরতে বাধা দেয়। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধা দেয়। রোজা রাখতে বাধা দেয়, ইত্যকার গৎবাঁধা কিছু কথা! হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজব করেই সময় পার করছে সবাই! তাদের হাবভাব দেখে মনেই হয় না, তারা ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছে! তাদের একটা জালেম সরকার তাড়িয়ে দিয়েছে! মনে হচ্ছে, তারা পিকনিকে এসেছে!

***

পরদিন পরিষদের অফিসে গেলাম! এটা নিয়ন্ত্রণ করে প্রবাসী উইঘুর সরকার! প্রবাসী সরকারের একমাত্র কাজ হলো, তুর্কি সরকারের গুণগান গেয়ে অনুদান আদায় করা! মামার নাম বললাম, ঠিকানা দিলাম! পরদিন আসতে বলা হলো! আমি আর আলি ঘুরতে বের হলাম! আঙ্কারায় দেখার জায়গার অভাব নেই। কিন্তু মনের শান্তি না থাকলে, ঘোরা যায় না। আলি ব্যাপারটা বুঝতে পারল! তাই হোটেলে ফিরে যাওয়াই স্থির হলো!

***

পরদিন আবার গেলাম! তারা জানাল তারা কোনও খোঁজ বের করতে পরেনি। তবে কাশগড়ের কিছু মানুষ এখানে আছে! তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে কোনও সূত্র বের হতে পারে! সারাদিন খোঁজাখুঁজি চলল! আরও একটা দিন চলে গেল! আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে! যা করার আগামী দু-তিনদিনের মধ্যেই করতে হবে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাতের দিকে হোটেলের নাম্বারে একটা ফোন এল। গলাটা পরিচিত পরিচিত লাগছিল! পরক্ষণেই গলা দিয়ে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বের হলো:

-ভাইয়া?

-জি! ঠিক আছে, তুই ফোন রাখ আসছি!

আমি পারলে তখনই ছুটে যাই নিচের রিসেপশনে! সেই কবে ভাইয়াকে দেখেছি! ছোটবেলায়! আর দেখিনি! তিনি এখন দেখতে কেমন হয়েছেন? দাড়ি-গোঁফ হয়েছে মুখে? এসব ভাবনার মধ্যেই দরজার বেল বাজল! দরজা খুলেই ছোট্ট ছেলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম ভাইয়ার বুকে! ছোট্ট ছেলের মতো কান্না পেয়ে গেল! ভাইয়াও কাঁদছেন! রুমে থাকা আলিও বারবার চোখ মুছছিল! জীবনে কখনো ভাবিনি, ভাইয়ার সাথে দেখা হবে! চট করে মনে পড়ল মেজো ভাইয়ার কথা! আলিঙ্গন থেকে নিজেকে আলগা করেই প্রশ্ন করলাম

-উসমান ভাইয়া কোথায়?

ভাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,

-সে শহীদ হয়েছে!

-কোথায়?

-কাশগড়ে! কুলসুম আর মামাদের বাঁচাতে গিয়ে! কার কাছে যেন সেনারা খবর পেয়ে গিয়েছিল আমাদের আস্তানার ঠিকানা সম্পর্কে! সবাই তোকে সন্দেহ করেছিল! আমাদের গোয়েন্দা তোকে যাচাই করে দেখার জন্যে সাংহাই গিয়েছিল! সে ফিরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে, এই হামলার সাথে তোর কোনও সংযোগ নেই!

-আমার কাছে গিয়েছিল? কই না তো!

-আরে বুদ্ধু, সেটা কি ঢাকঢোল পিটিয়ে যাবে?

প্রশ্ন করব কী, আমার হাসি পেল! ভাইয়া আমাকে বুদ্ধু বলে ক্ষেপানোর অভ্যেস আজো ছাড়তে পারেননি। ছোটবেলায় বুদ্ধু বললে, আমার সে কী রাগ! এখন ভাবলেও হাসি পায়! কান্নাও আসে, কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো! সবাই আছে! কাছাকাছি! পাশাপাশি! কুলসুমের কথা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পাচ্ছিলাম আবার ভয়ও পাচ্ছিলাম! যদি বিরূপ কিছু শুনতে হয়? ভাইয়া আমার মনোভাব বুঝতে পেরেই বললেন:

-চিন্তা করিস না, ওরা আছে! ভালো আছে! তোর অপেক্ষাতেই আছে!

-ওরা মানে?

-ওহ, তুই তো জানিস না! ওরা মানে, কুলসুম আর উসামা! মানে তোর ছেলে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-আল্লাহু আকবার! আলহামদুলিল্লাহ! আচ্ছা ভাইয়া, তারপরের ঘটনা কী?
-সেনারা চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল! আমাদের কিছু সাথি ভেতরে আটকা পড়ল! কিছু সাথি তখন কর্ডনের বাইরে! আমিও বাইরে ছিলাম! আমাদের লক্ষ্য ছিল ঘেরাও থেকে যত বেশি সম্ভব নিরীহ মানুষকে বের করে আনা! কিছু ভাইকে হামলার জন্যে রেখে বাকিদের ঘেরাওয়ের বাইরে চলে আসার জন্যে নির্দেশ দেয়া হলো। কুলসুম আর মামা-মামিমাকে বের করে আনা গেছে! মহল্লার আরও অনেককে বের করা গেছে! যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাদের বের করা সম্ভব হয়নি। কুলসুমদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার সময়ই চায়না সেনাদের লাইন অব ফায়ারে পড়ে যায় তারা! কুলসুমদের পাঠিয়ে দিয়ে উসমান তাদের কাভার দিতে থাকে! সেখানেই উসমান শহীদ হয়।

তারপর আমরা রাতের আঁধারেই নিরাপদ স্থানে সরে পড়লাম! তারপর ওদের তুরস্কে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমিও সাথে এলাম! শুরু হলো দীর্ঘ পদযাত্রা। প্রায় একমাস পর তুরস্কে পৌঁছলাম। আর ফিরে যাইনি। যাওয়ার সুযোগ পাইনি! এর মধ্যে ইরাক-সিরিয়াতে তাকাযা দেখা দিল। আমাদের ওদিক থেকে ভাইয়েরা এদিকে এসে যোগ দিতে শুরু করল। চীনের সরকারি ভাষ্যমতে পাঁচ হাজারেরও বেশ উইঘুর ইরাক-সিরিয়াতে আছে এখন! বাস্তবে সংখ্যা আরও বহু বেশি!

-আমার খোঁজ কীভাবে পেলেন?
-আমরা জানতাম তুই একদিন না-একদিন এদিকে আসবিই! তাই কাশগড়ের সবাইকে বলে রাখা হয়েছিল! তুই আজ যাদের কাছে গিয়েছিলি, তারা নতুন এসেছে! তাই সন্ধান দিতে পারেনি! আর আমরা একটু আড়ালেই থাকি! তুই সুদানে থাকিস সেটা অনেক চেষ্টা করে বের করেছিলাম! কিন্তু কোথায় থাকিস সেটা বের করতে পারছিলাম না! অবশ্য আর মাসখানেক সময় পেলে তাও বের করে ফেলতে পারতাম! আল্লাহর অশেষ রহমত! তিনি আমাদের আবার মিলিয়ে দিয়েছেন! এখন চল, সবকিছু গুছিয়ে নে!
-আমার বন্ধু আলি?
-সেও সাথে যাবে!

***

মন চাচ্ছিল উড়ে যাই! কেমন হয়েছে উসামা? কুলসুম কী ভাবছে আমাকে নিয়ে? আমি আগের মতো উড়নচণ্ডী হয়ে গেছি? তার সাথে কাটানো জীবনের সোনালি 'পলক'গুলোকে ভুলে গেছি? না না, কুলসুম! আমি কিছুই ভুলিনি! তবে একটুখানি বদলে গেছি! তোম[illegible] কিছু কথা বলার আছে! ক্ষমা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চাওয়ার আছে! তোমাকে নিয়ে আমার অনেক কিছু করার আছে! তুমি বলেছিলে, স্বপ্নে আমাদের দুজনকে একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেছ! এই দেখো, আমি জান্নাতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছি! আপাতত তুমিই আমার জান্নাত!

***

আমি মামাকে জড়িয়ে ধরব কি, মামাই উড়ে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাত রাজার ধন ফিরে পেয়েছেন যেন! ভাইয়া হাত ধরাধরি করে 'ছোট্ট' একটা মেহমান নিয়ে এলেন। কী নরম আর আদুরে বেড়ালছানার মতো! সবার সামনে কোলে তুলে আদর করতে লজ্জা লাগছিল! মামা হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট একটা বাসা! বিদেশে এর বেশি আশা করা যায় না! একটা কামরার সামনে গিয়ে জোরে বললেন:

-কুলসুম, এই যে আমীর এসেছে!

সালাম দিয়ে কামরায় প্রবেশ করলাম! তাকে দেখার সাথে সাথে অদ্ভুতভাবে একটা কথা মনে হলো, আমি আসলে কুলসুমের জন্যেই সাংহাই থেকে ছুটে এসেছিলাম! পাঁচটা বছর আমি ভুলে থাকলেও, আমার প্রতিটি রক্তকণিকা কুলসুমকে স্মরণ করে গেছে! আমার প্রতিটি শ্বাস কুলসুমকে জপে গেছে! আমার প্রতিটি পদক্ষেপ কুলসুমের দিকে গেছে! আমি যদি কুলসুমকে না পেতাম, হয়তো জীবনে বিয়েই করতাম না!

***

উসামা তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল! কুলসুম আমার সেই যে হাত ধরেছে আর ছাড়ছেই না! আমি তার দিকে শুধু তাকিয়েই আছি! তাকিয়েই আছি! পলকই ফেলছে না! কুলসুম কি খুব বেশি সুন্দর? উঁহু, না! কুলসুম কি অনেক গুণবতী? উঁহু, না! কুলসুম কি খুব বেশি জ্ঞানী? উঁহু, না! তা হলে কুলসুম কী? কুলসুম হলো কুলসুম! আমার স্ত্রী! আমার জীবনসঙ্গিনী! আমার সাধনার ধন! আমার হারানো রত্ন! আমার কুড়ানো মাণিক! আমার হৃদয়ের রানি! আমার জান্নাতের সঙ্গী! আমার .... আমার....!

***

হু-হু করে কেটে গেল কয়েকটা দিন। সকালে আলি আর উসামাকে নিয়ে বের হই, বিকেলে কুলসুম আর উসামাকে নিয়ে বের হই! প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কমে এল। আস্তে আস্তে ভবিষ্যতের চিন্তা সামনে এসে পড়ল! মামার কাছে পরামর্শ চাইলাম, কী করা যায়? সুদানে ফিরে যাব, নাকি তুরস্কেই যা হোক একটা কিছু জুটিয়ে নেব? মামা বললেন, ভালো করে ভেবে দেখো!

রাতের বেলা কুলসুম বলল,

-আপনি নাকি এখানে চাকরি খুঁজছেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

-চাকরি খুঁজছি না! কী করব সেটা নিয়ে ভাবছি!

-আর কত চাকরি করবেন?

-না করলে, খাব কী করে?

-খাবারের চিন্তা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন! তার আগে বলুন, কাশগড়ের সেই রাতের কথা মনে আছে?

-কোন রাত?

-বায়আতের?

-হাঁ, হাঁ, কেন মনে থাকবে না! অবশ্যই মনে আছে! কিন্তু এখন কাশগড়ে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব?

-ওখানে ফিরে যেতে হবে কেন! উল্টো ওখান থেকেই মানুষ দলে দলে এদিকে আসছে!

-এদিকে মানে আঙ্কারায়?

-জি না, আরও দূরে! সীমান্ত পেরিয়ে!

-ও আচ্ছা, বুঝেছি! কুলসুম তুমি ঠিক কী ভাবছ, সব খুলে বলো তো?

-আমরা একসাথে জান্নাতে যাওয়ার কথা ছিল না? আমার একান্ত ইচ্ছা, আমরা সে জান্নাতের দিকে রওয়ানা দিই! আপনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ! ওখানে আপনার অনেক কাজ! আমি আপনার পাশে থেকে প্রেরণা যোগাতে পারব!

-ভাইয়া কী বলেন?

-আমরা সবাই আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম! ভাইয়া এর মধ্যে একবার গিয়ে পথঘাট সব চিনে এসেছেন! এখন আপনি প্রস্তুত হলেই আর কোনও বাধা থাকে না!

-ব্যাংকে আমার কিছু টাকা ছিল! ওগুলো আনানোর ব্যবস্থা করে তারপর রওয়ানা দিই?

-টাকার জন্যে থেকে গেলে নতুন করে মোহ তৈরি হতে পারে! সম্পদ ও সন্তান বান্দাকে সবসময়ই পরীক্ষায় ফেলে দেয়! বান্দার সামনে শুধুই 'অপশন' দেয়! লোভ দেখিয়ে বলে, কোনটা বেছে নেবে বলো! এজন্যে নিরাপদ হলো, এসবকে এক লহমায় ছুঁড়ে ফেলে 'আল্লাহর রাস্তায়' বেরিয়ে পড়া! কাঙ্ক্ষিত জান্নাতের দিকে পা বাড়িয়ে দেয়া!

-চলো!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

# সেপালকার ইন লাভ

বৈরুত। নামটা ফিনিশীয়দের দেয়া। অর্থ, কূপ। পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো শহর। প্রাচ্যের প্যারিস বলা হয় এ-শহরকে। প্রাচ্যের সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে বৈরুতের অবস্থান প্রায় শীর্ষে। এখন অবশ্য সুন্দর এই বন্দরনগরী নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছে। শুরু হয়েছে সেই ১৯৭৫ সালে। চলবে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের ধাক্কায় এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ থামবে। ভয়ংকর এই গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল বহু গোষ্ঠী।

বৈরুতের রাস্তায় একলোক হাঁটছে। জীর্ণ পোশাক। শীর্ণ দেহ। উস্কুখুস্কু চুল। দীর্ঘদিনের অধোয়ার কারণে দাড়িগুলো জট পাকিয়ে আছে। নগ্ন পা। হাঁটছেও ধুঁকে ধুঁকে। এর ওর কাছে হাত পাতছে। সবাই দূর থেকে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। কারণ মানুষটার গা দিয়ে সারাক্ষণ বোটকা গন্ধ বের হয়। নাকে হাত চাপা দিয়েও পার পাওয়া যায় না। গোসল করেছে কতদিন হয়েছে, কে জানে! গায়ে চাপানো কোটটার আসল রং সেই কবে হারিয়ে গেছে! ময়লার পুরু আস্তরণ জমাট বেঁধে আছে।

বৈরুতের কেউ লোকটাকে কখনো কথা বলতে দেখেনি। জিজ্ঞেস করলেও উত্তর মেলে না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টিটাও কেমন যেন! খ্যাপাটে পাগলাটে ধরনের! ঘোলা ঘোলা। অস্থির। তবে এঅবস্থা সব সময় থাকে না। লোকজন দয়া কা[illegible] পাগল হলেও লোভী নয়। কেউ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দান করলে, তার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু গ্রহণ করছে। নিতান্ত বাধ্য না হলে গ্রহণ করছে না। কেউ দুটি রুটি দিলে একটি গ্রহণ করছে। কারণ তার একটা দরকার। লোকজন এই নির্মোহ ফকিরের প্রতি সশ্রদ্ধ না হয়ে পারে না। মানুষের মনই এমন; ব্যতিক্রমী কিছু চায়। স্বাভাবিকের বাইরে কিছু পেলে লুফে নেয়। বিস্মিত হয়। আগ্রহী হয়ে ওঠে। সবকিছু চাপিয়ে মানুষটার একটা বৈশিষ্ট্য সবাইকে আকৃষ্ট করে—লোকটার হাসি। পরিধেয় যেমনই হোক, চলন-বলন যা-ই হোক, পাগলামিকে চাপিয়ে, মানুষটার মুখে একটা স্মিত হাসি লেগে আছেই। ছোট-বড় সবার সাথে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করে। কথা না বললেও, অসৌজন্যমূলক কিছু করে না। বাচ্চা-কাচ্চা দেখলে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। খাওয়ার কিছু থাকলে শিশুদের দিকে বাড়িয়ে দেয়! ছোটাছুটি করতে গিয়ে কোনও শিশু ব্যথা পেলে, দৌড়ে গিয়ে উঠিয়ে দেয়। রক্ত বের হলে কোলে করে ছুটে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সাথে একটা বেড়ালছানাও থাকে প্রায় সময়। শহরে যত বেড়াল আছে, সবগুলোর সাথেই তার সখ্য। ছোট ছেলেমেয়েদের সাথেও। শুধু একটাই সমস্যা—কথা বলে না। আগে বেশি পীড়াপীড়ি করলে, লিখে উত্তর দিত। এখন তাও দেয় না। দেয়ার প্রয়োজনও পড়ে না। সবাই জানে পাগলটা সম্পর্কে। তাদের জীবনের এক অভ্যস্ত অনুষঙ্গ হয়ে গেছে পাগলটা। একদিন না দেখলে খোঁজখবর করতে শুরু করে দেয়। তার খাওয়া-দাওয়া হলো কি না, চিন্তা করে।

***

তার বিরুদ্ধে কারও কোনও অভিযোগ ছিল না। নিজের কাছে খাবার থাকলে ছোটদের দেয়। রাস্তার কাককে খাওয়ায়। বসে বসে কুকুরকে খাওয়ায়। বেড়ালকে খাওয়ায়। তার বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর না হলেও, শিশুরা তাকে ভয় পেত না। সে কখনো মহিলাদের দিকে চোখ তুলে তাকাত না। সারাদিন এদিক সেদিক হাঁটার ওপর থাকত। যেখানে রাত হতো, মাটিতেই শুয়ে পড়ত।

লোকটার কোটের পকেটে একটা জীর্ণ ছেঁড়াপাতার ডায়েরি থাকে। লেখা থেকে বোঝা যায়, একজন নারী ছিল এই ডায়েরির মালিক। ডায়েরির মধ্যে অস্পষ্ট ঝাপসা একটা স্টিল ফটোগ্রাফও আছে। বিবর্ণ মলিন। একটা পরিবারের ছবি। শাদাকালো। কারও চেহারাই পরিষ্কার বোঝা যায় না। পাগলটা সময় পেলেই ছবিটার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। একটু পর পর ঝাপসা হয়ে আসা চোখ মোছে। তার চোখে পানি দেখে, আশপাশ থেকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে থাকা মানুষজনেরও দু-চোখও ভিজে ওঠে! আহা বেচারা! সবাইকেই বোধ হয় হারিয়েছে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

***

প্রথম দিকে পাগলটা কাউকে তার ডায়েরি পড়তে দিত না। দেখতেও দিত না। কেউ জানতও না ডায়েরিটার কথা। একদিন হঠাৎ করে বের হয়ে পড়ল। তখনো পাগলটা সর্বজনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। দুষ্ট ছেলের দল পাগলকে দৌড়ানি দিয়েছে, পাগলটাও ইট-পাথরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে মরিয়া হয়ে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তার কোণে উঠে থাকা ইটের সাথে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তখনি কোটের পকেট থেকে একটা ডায়েরি বের হয়ে এল। ছেলেরা ডায়েরি নিয়ে ছুট দিল। বড়রা ভীষণ অবাক হয়ে দেখল ডায়েরিতে অনেক কিছু লেখা। পুরোটা পড়ে, যতটুকু জানা গেল:

-পাগলটার বাড়ি ফিলিস্তিনে। ইহুদীদের কারাগারে বন্দী ছিল। তার একমাত্র বোন ইহুদীদের নির্যাতনের জ্বালা সইতে না পেরে, রাতের আঁধারে পালিয়ে এসেছে। খবর পাওয়া গেছে, সে বৈরুতের কোথাও আছে। ইহুদীরা পরিবারের বাকি সবাইকে মেরে ফেলেছে! কারাগারে টর্চারের কারণে, চিৎকার করতে করতে গলা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের হয় না। মাথাও সব সময় ঠিক থাকে না। পৃথিবীতে বোনই একমাত্র জীবিত আত্মীয়। এর মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল। লোকজন প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যেও ঠিকই পাগলটার দিকে নজর রেখেছে। পাগলটা নির্বিকার! ইসরায়েলি বোমা পড়ছে, বিভিন্ন দলের নানামুখী রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলছে। সে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মসজিদে গির্জায় সিনাগগে—সর্বত্র। পাগলটার ধর্ম নিয়ে শুরুর দিকে একটু ধোঁয়াশা ছিল। পরে ডায়েরি পড়ার পর কেটে গেছে। সে একজন ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টান। জেরুজালেমের ওল্ডসিটিতে তাদের চৌদ্দপুরুষের নিবাস। বৈরুতে এসেছে বোনের খোঁজে! ঘটনার শুরু আরও আগে!

***

গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, বৈরুত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চতুর্মুখী যুদ্ধে বিধ্বস্ত অবস্থা। এরমধ্যে ইসরায়েলি বাহিনীও এসে যোগ দিয়েছে। কয়েক দিক থেকে তারা হামলা শুরু করেছে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলো তাদের বিরুদ্ধে। ইহুদীরা পাল্টা আঘাত হানতে নির্বিচারে বিমান হামলা শুরু করল। ইহুদী স্নাইপাররাও ওত পেতে থেকে হত্যা করল অসংখ্য মুসলিম যোদ্ধাকে। হিংস্র ইহুদীরা ঘটাল সাবরা-শাতিলায় ভয়ংকরতম বর্বর হত্যাকাণ্ড! অসহায় উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনি মানুষগুলো বেঘোরে মারা পড়ল!

এতকিছুর পরও পাগলটা বহাল তবিয়তেই আছে। ঘুরছে ফিরছে। রাস্তায় রাস্তায়। অলিতে গলিতে। এখানে ওখানে। যুদ্ধ তার গতিবিধিতে কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। সে আছে নিজের মতো করে। কেউ কেউ চেষ্টা করেছিল তাকে নিরাপদ বাংকারে লুকিয়ে রাখতে। তাদের সাথে সানন্দে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যায়। কিছুক্ষণ থেকে আবার কোন ফাঁকে বেরিয়ে চলে আসে বাংকার থেকে। আটকে রাখা যায় না। ইসরায়েলি সেনারা বৈরুতের পশ্চিমাংশে অবস্থান নিল। লোকজন হায় হায় করে উঠল। পাগলটার আনাগোনা যে ওদিকটাতেই বেশি! নির্ঘাত মারা পড়বে। সবাই চিন্তিত! কী হবে অসহায় পাগলটার? ইসরায়েলি পশুগুলোর মনে কি দয়ামায়া বলে কিছু আছে?

***

উৎসাহী দরদি কয়েকজন মানুষ পাগলটার খোঁজে এল। মুহুর্মুহু বিমান হামলা চলছে। ইসরায়েলি কনভয় সাবরা-শাতিলায় গণহত্যা শেষ করে এদিকেই আসছে। পাগলের খোঁজে আসা লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটা বহুতল ভবনের ভগ্নাবশেষের আড়ালে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, পাগলটা রাস্তার পাশে বসে আছে। ইহুদী বাহিনী এগিয়ে আসছে! থেমে থেমে ব্রাশ ফায়ার করে রাস্তা নিরাপদ করছে! যাতে কেউ কাছে ঘেঁষতে না পারে! আহ! বেচারাকে বুঝি বাঁচানো গেল না! তাকে রাস্তার কোল ঘেঁষে বসে থাকতে দেখেই গুলি করবে ইহুদীরা! ভাববে, ফিলিস্তিনি ফিদাঈ! পাগলের ছদ্মবেশে ওত পেতে আছে!

ইসরায়েলি কনভয়ের প্রথম গাড়িটা পাগলটার ঠিক সামনে এসে ব্রেক কষল। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল পুরো কনভয়। একজন পদস্থ অফিসার তড়াক করে জিপ থেকে নেমে সটান স্যালুট হাঁকাল। ব্যাজ দেখে কর্নেল মনে হয়! পাগলটা পিটপিট করে তাকাল। তারপর সিনা টান করে দাঁড়িয়ে হাতকে সামান্য তুলে স্যালুটের জবাব দিল। আশেপাশ থেকে উঁকি মারা লোকেরা তাজ্জব, পাগলের ফিটনেস দেখে। অথচ এতদিন লোকটা কী ভীষণ কুঁজো হয়ে ধুঁকে ধুঁকে হাঁটত। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানত না। অফিসারটি পাগলের মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল। নিজেই লাইটার জ্বালাল ফস করে। অগ্নিসংযোগ করে দিল। পাগল বলল:

-আবিপ, তোমরা পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেলেছ!

-এক জায়গায় এমবুশে পড়েছিলাম! স্যার! আর দেরি করা যাবে না! আপনার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে!

-কীভাবে?

-আপনার বোন!

-তার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম?

-তাকে পাইনি, তবে মূলব্যক্তিকে পেয়েছি! ব্যবস্থা নিয়েছি!

-গুড! চলো!

পাগলকে সসম্মানে উঠিয়ে নিয়ে পুরো কনভয় আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল! লোকজনের বিস্ময়ে ঠিকরে বের হওয়ার উপক্রম চোখের সামনে দিয়ে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এক. আমাদের দেশে এমন পাগল কয়জন আছে?

দুই. আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চ পদগুলোতে এমন পাগলের সংখ্যা কত?

তিন. পোশাকাশাকে পাগলটার মতো না হলেও, ধোপদুরস্ত সুস্থ পাগলের সংখ্যা মুসলিম দেশগুলোতে কত হবে?

***

খ্রিষ্টানদের কাছে পবিত্রতম গির্জা হলো 'কানীসাতুল কিয়ামাহ'। হোলি সেপালকার চার্চ। পুরোনো জেরুসালেমে। সেপালকার অর্থ লাশ রাখার স্থান। বেদি। স্মৃতিস্তম্ভ। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসমতে এখানে একটা পাথর আছে, তার ওপরেই যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এখানেই যিশুকে কবর দেয়া হয়েছিল। এগির্জার পাশেই মসজিদে উমর। বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের পর আমীরুল মুমিনীন এখানেই দু-রাকাত সালাতে ফাতহ আদায় করেছিলেন। তার নামাজের জায়গাতেই গড়ে উঠেছে মসজিদ।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবি রহ. যখন কুদস জয় করেন, তখন এই গির্জার দখল নিয়ে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত লেগে যায়। আর্মেনিয়ান চার্চ, রোমান ক্যাথলিক ও অন্যান্য দল নিজেরা এ গির্জার ধারকবাহক হতে উঠেপড়ে লাগে। কারও কারও মতে, তখন সালাহুদ্দীনের সরাসরি হস্তক্ষেপে বিবাদ মেটে। তিনি খ্রিষ্টানদের সম্মতিক্রমে এক প্রতিবেশী মুসলিম পরিবারের হাতে গির্জার চাবি তুলে দেন। সে থেকেই 'আলে জাওদাহ' পরিবার বংশানুক্রমে প্রতিদিন গির্জা খোলে ও বন্ধ করে।

বর্তমানে গির্জার চাবিদার হলেন আবেদ জাওদা। তার বাবা-দাদাও এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। জাওদা বংশেরই এক সন্তান আলি জাওদাহ। দাদার হাত ধরে আলিও মাঝেমধ্যে গির্জার দ্বার খুলতে আসে। গির্জায় কখন কারা পূজা করতে আসবে তার সময় ভাগ করে দেয়া আছে। প্রথমেই আসে 'আর্মেনিয়ান খ্রিষ্টানরা'। তারপর আসবে আরেক মতাবলম্বী খ্রিষ্টান। এভাবে চলে আসছে।

***

আজ বৃহস্পতিবার। বিশেষ পূজা হবে সেপালকারে। পুরোহিতদের সাথে সাধারণ মানুষও অংশ নেয়। ভোর চারটা বাজে। আজও বাইবেল পাঠ হয়েছে। বিশেষ পদ্ধতিতে প্রণাম-পূজা হচ্ছে। যাজকদের সাথে অল্প কয়েকটা আর্মানি পরিবার এসেছে। তীর্থযাত্রীদের একজনকে দেখে মনে হচ্ছে, তার আগ্রহ পূজাপাটের চেয়ে অন্য কোনও দিকে। গির্জার পূজা-পাট অংশ না নিলেও, জাওদা পরিবারের চাবিরক্ষক গির্জার অভ্যন্তরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। নানা দল নিয়ে কাজ কারবার। হিংসাবশত কেউ উল্টাপাল্টা কিছু করে রেখে গেল, তার দায় চাপবে চাবিধারীরওপর। এজন্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কড়া পাহারা রাখতে হয়। এরা তাদের পবিত্রতম স্থানে এলেও আসার সময় মনটা পবিত্রতম করে আনতে পারে না। খালি অন্য দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবে। তারাই যিশুর সাচ্চা অনুসারী, বাকিরা ভণ্ড! জাওদা পরিবারকে এসব অহরহ শুনে যেতে হয়। শুনতে শুনতে তাদের কান পচে গেছে।

দাদা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। ভোর চারটায় একা একা আসতে পারেন না। সাথে নাতিদের কেউ আসে। দাদার হয়ে গির্জার দরজা খুলে দেয়। দাদাকে সঙ্গ দেয়। কথা বলে। পুণ্যার্থীদের আনোগোনা দেখে। চৌকান্না থাকে। আলি জাওদা দাদাকে বসিয়ে এদিক-ওদিক নজর রাখছে। তার চোখ পড়ল, এক সন্ন্যাসিনীর ওপর। কালো আলখেল্লায় আপাদমস্তক আবৃত। প্রবেশ করার সময় এ কোথায় ছিল? দেখা গেল না যে? সবাই পূজায় ব্যস্ত, সন্ন্যাসিনী দেয়ালের কাছ ঘেঁষে হাঁটছে আর গভীর অভিনিবেশে কী যেন খুঁটে খুঁটে দেখছে। কী দেখছে? নান হয়ে কাজে ফাঁকি? আলি এগিয়ে গেল! তাকে দেখে নান একটু চমকে উঠল। সাথে সাথে অবশ্য মিষ্টি হাসিতে চোখমুখ উজ্জ্বল। সপ্রতিভ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল:

-আপনি বুঝি দরজার তালা খুলেছেন?

-জি না, আমার দাদাজির কাছে চাবি থাকে! আমি তার সাথে এসেছি! তার বয়েস হয়ে গেছে কিনা! একা একা খুলতে পারেন না!

-কিছু মনে না করলে, আমি আসলে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি! আপনাকে বলব?

-আমি গির্জার কেউ নই!

-জানি। আমার প্রয়োজনটা গির্জাসংশ্লিষ্ট নয়!

-তাহলে?

-আমি কি আপনাদের পারিবারিক লাইব্রেরিটা একটু দেখতে পারি?

-অবশ্যই পারেন! কিন্তু সেখানে আপনার কী প্রয়োজন? আপনি সেটার কথা কীভাবে জানতে পারলেন?

-আমি খলীল (হেবরন) ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ইতিহাস আমার সাবজেক্ট। হোলি সেপালকার সহ এখানকার প্রাচীন গির্জাগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করব। আমি শুনেছি, সেই সালাদীনের আমল থেকেই আপনাদের পরিবার এখানে দায়িত্ব পালন করে আসছে। যুগে যুগে তাদের কাছে অনেক স্মৃতি অনেক ঐতিহাসিক বস্তু হয়েছে। আমার মনে হয়, লাইব্রেরিটা আমাকে একটু দেখতে দিলে, আমার গবেষণায় অনেক সহযোগিতা হবে। আমার আব্বুও এমনটা মনে করেন। আব্বুই আমাকে আপনাদের পারিবারিক সংগ্রহশালার কথা জানিয়েছেন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-ও, আপনি তা হলে পেশাদার নান নন?
-পেশাদার না হলেও, অপেশাদারও নই!
-মানে?
-আমরা যারা এখানে আর্মেনিয়ান আছি, তারা পালাক্রমে বংশানুক্রমে যিশুর ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছি! পড়াশোনা শেষ করে হয়তো এসে নান হিশেবে যোগও দিতে পারি!
-কিন্তু এমন কথা তো আপনাদের প্রায় সব দলই বলে বেড়ায়! নিজেদের যিশুর আসল অনুসারী বলে!
-অন্যরা কে কী বলে সেটা আমার জানার দরকার নেই! আমাদের আর্মেনিয়ান চার্চই যিশুর প্রকৃত অনুসারী!
-আচ্ছা আচ্ছা থাক, আমার প্রতি রাগ করার দরকার নেই! আমি নিজ থেকে একথা বলিনি! অন্যরা আমাদের কাছে নালিশ দেয় বলেই কথাটা পেড়েছি!
-এখন বলুন, আমার পক্ষে কি লাইব্রেরিটা ব্যবহার করা সম্ভব?
-এটা আমি বলতে পারব না। দাদু বলতে পারবেন। চলুন আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাই!

***

এটা ছিল সূচনা! তারপরের ঘটনাগুলো ছাড়া ছাড়াভাবে ডায়েরিতে তারিখসহ লেখা আছে।

৩ মার্চ, ১৯৭৩

আজ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। হোলি চার্চে গিয়েছি ভোর চারটায়। উত্তেজনায় সারারাত একফোঁটা ঘুমুতে পারিনি। কখন তিনটা বাজবে, আমরা কখন রওয়ানা দেব। চার্চে যাব। আমার অবশ্য চার্চের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই, আমার পরম আরাধ্য বিষয় হলো, জাওদা পরিবারের লাইব্রেরিটা। আমার স্যারই এটার সন্ধান দিয়েছেন। তিনি মুসলমান এবং পুরুষ। তিনি যেভাবে লাইব্রেরিতে প্রবেশের অনুমতি নির্বিঘ্নে পেয়ে গেছেন, আমি কি পাব? ভাইয়া অবশ্য অভয় দিয়ে বলেছেন:
-তারা শত শত বছর ধরে গির্জার চাবির দায়িত্ব পালন করে আসছে। তোকে অবশ্যই অনুমতি দেবে। তুই নিশ্চিত থাক, খুশি মনেই পড়তে দেবে! যদি না দেয়, সে দেখা যাবেখন!
আমি শুধু শুধুই আশঙ্কা করছিলাম। তারা খুবই ভালো মানুষ। বিশেষ করে আলি। তার সাথে চার্চের করিডোরে দেখা হয়ে যাওয়াটাও বড় ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী ভদ্র আর মার্জিত ছেলে! বৈরুতে পড়াশোনা করে। বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। একদিনেই মনে হয়েছে তাকে চিনে ফেলেছি। সে আমাকে বুড়ো দাদুর কাছে নিয়ে গিয়েছে। তিনি খুশিমনেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুমতি দিয়েছেন। আলির ঘাড়েই দায়িত্ব চাপিয়েছেন, আমাকে সহযোগিতা করার জন্যে।

আলি নিজে সাথে থাকতে না পারলেও, তার মা আমাকে বলতে গেলে সারাক্ষণ সঙ্গ দিয়েছেন। কুদসের মুসলিম পরিবারগুলো এত মিশুক হয়, আগে জানতাম না তো! আমার সাথে অসংখ্য মুসলিম ছেলে পড়ে। তাদের সাথে কখনো প্রয়োজনের বেশি কথা হয়নি। তবে সবাইকে ভদ্র হিশেবেই দেখেছি। কিন্তু একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে কখনো যাওয়া হয়নি। আফসোস হচ্ছে, আগে থেকেই কেন পরিবেশটার সাথে পরিচিত হলাম না!

***

১০ মার্চ, ১৯৭৪

উফ! গত কয়েকটা দিন কী ছটফটানিই-না গিয়েছে। ভাইয়াকে পইপই করে বলে দিলাম, আমাকে নিয়ে যেতে, তার সময় হলে তো! তিনি কী-সব আন্দোলন করে বেড়াচ্ছেন! আজ তাকে আর নিস্তার দিইনি। একদম সাত সকালে উঠেই তার ঘাড়ে চেপে বসেছি। আজকাল জেরুযালেমে এতদূর পথ একা একা যাওয়া যায়? সাথে পুরুষ কেউ থাকলে তবেই ভরসা পাওয়া যায়। যেখানে যাব তার আশেপাশে সবাই মুসলিম। একটু ভয় ভয় করে! পথে পড়ে কয়েকটা ইহুদী পাড়া! গা কেমন ছমছম করে! এই বুঝি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

আমার মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল, আজ আলির সাথে দেখা হবে। তার সাথে বৈরুতের পড়াশোনা নিয়ে কথা বলব। আমিও সেখানে যেতে পারি কি না, যাচাই করে দেখব! তা আর হলো কই! তার মা বলল, সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়! রাত হলে ডেরায় ফেরে! ভোর হলে আবার চম্পট! দাদুর সাথে গির্জায়ও যেতে চায় না! তার নাকি গির্জায় যেতে ভালো লাগে না। শুধু দাদুর কষ্টের কথা ভেবেই যাওয়া!

আমার পড়াশোনা ভালোই এগুচ্ছে। আরবী কবিতার প্রতি আমার আজন্ম ভালোবাসা! আব্বুর প্রিয় কবি হলেন আখতাল (৬৪০-৭১০)। তিনি বনু উমাইয়া যুগের সেরা তিন কবির একজন। খ্রিষ্টান হয়েও তিনি মুসলমানদের মাঝে থেকে কাব্যলক্ষ্মীর চর্চা করে গিয়েছেন। তার কবিতা আব্বুর লাইন কে লাইন মুখস্থ। কিন্তু ঘরে তার *দীওয়ান* ছিল না। শুনেছি বৈরুত থেকে তার *দীওয়ান* (কাব্যসমগ্র) ছাপা হয়েছে। আলির সাথে আরেকবার দেখা হলে ভালো হয়। একটা *দীওয়ানে আখতাল* সংগ্রহ করতাম।

আম্মুও কাব্যরসিক! তার প্রিয় কবি হলেন 'মাই যিয়াদাহ'। ১৮৮৬-১৯৪১। আম্মু নারী বলেই হয়তো তার প্রিয় কবিও একজন নারী। মাই যিয়াদাহ প্রিয় হওয়ার আরও একটা কারণ, তিনি লেবাননের কবি হলেও, কবির মা একজন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফিলিস্তিনি। আম্মুও নাকি একসময় স্বপ্ন দেখতেন, তার প্রিয় কবির যিয়াদার মতো জীবনে বিয়ে করবেন না। কাব্যসাধনা করেই জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর হলো কই! আমি আম্মুর কথা শুনি আর হাসি! তাকে রাগানোর জন্যে বলি:

- মাই যিয়াদাহ কুমারী থাকার একটা যুক্তিসংগত কারণ আছে! তোমারও কি তেমন কোনও কারণ আছে?

-কী সব আজেবাজে কথা বলিস!

-তুমি জানো না, যিয়াদা একজনকে পছন্দ করত?

-কাকে?

-কেন খলীল জিবরানকে? বিশ বছর চিঠি লিখেছে, একজন আরেকজনকে। মজার ব্যাপার হলো জীবনে একবারও তাদের দেখা হয়নি। ভাগ্যিস তোমার এমন দুর্মতি হয়নি! নইলে আমি এত সুন্দর পৃথিবীর দেখা পেতাম না! মাই যিয়াদার আরও গুণ ছিল!

-কী গুণ?

-মিসরের বড় বড় প্রায় সব সাহিত্যিকই তার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে। আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ থেকে শুরু করে মুস্তাফা সাদেক রাফেয়ীসহ সবাই। বিকেল হলেই সবাই গিয়ে হাজির হতো যিয়াদার ডেরায়।

***

ঈশ্বর তার দাসের সব খবর রাখেন। আমি যে বহুদিন ধরে *দিওয়ানে আখতাল* খুঁজছি, এটা ঈশ্বর ছাড়া আর কে জানে? কেউ জানে না! আজ আলিদের কুতুবখানায় গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা ভলিউমের ওপর। জ্বলজ্বল করছে: *দীওয়ানে আখতাল*। আমি ভীষণ চমকে গেছি! এবাড়িতে কাব্যচর্চা কে করে? দৌড়ে আলির আম্মুর কাছে গেলাম। তিনি বোধহয় মিষ্টি হাসি আর আদর ছাড়া কথাই বলতে পারেন না।

-এবাড়িতে আখতালের কবিতা কে পড়ে?

-কেন সবাই পড়ে! আলির দাদু পড়ে, আলি পড়ে! আমি পড়ি!

-সবাই কবিতা পড়ে দেখছি! কুতুবখানায় কার কার কবিতা আছে?

-আরবের বড় বড় প্রায় সব কবির দীওয়ানই আমাদের সংগ্রহে আছে। তোমার শুনে ভালো লাগবে, আন্দালুসের নাসারা কবিদেরও কয়েকটা পাণ্ডুলিপি এখানে আছে।

-কীভাবে সংগ্রহ হলো সেগুলো?

-গ্রানাডার পতনের পর, সেখান থেকে পালিয়ে আসা কিছু ইহুদী পরিবার এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কাছ থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিনে নিয়েছেন সেগুলো। তোমার বুঝি কবিতা ভালো লাগে?

-জি, খুবই ভালো লাগে। আম্মু-আব্বুও কবিতা ভালোবাসেন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

***

২০ মার্চ, ১৯৭৪

কীভাবে যে দিনগুলো হু-হু করে চলে যায়, টেরটিও পাওয়া যায় না। দশটা দিন জীবন থেকে হারিয়ে গেল। বড্ড দোটানার মধ্যে আছি, আমি কি আরবী কবিতা পড়ব নাকি চার্চের ইতিহাস পড়ব? আর অল্প সময়ের জন্যে গিয়ে কিছুই পড়া যায় না। আম্মুর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছিলাম। যদি ওবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা থাকে, আমি থেকে যাব। একটা ব্যাগে করে কিছু জামা-কাপড়ও নিয়ে এসেছি! আলির আম্মুকে গতবার আকারে-ইঙ্গিতে বলেছিলাম। তিনি রীতিমতো লুফে নিয়েছেন আমার ইচ্ছেকে।

-থাকতে পারবে না মানে? কেন পারবে না! এটা তোমার ঘর! তোমার মতো পড়ুয়া মেয়ে পেলে আমার খানাপিনাও লাগবে না। সারাক্ষণ কথা বলার মানুষ পাওয়া যাবে। ছেলেটাকে কাছে পাই না। ওর বাবা নেই জানো তো!

-জানি না তো! তার কী হয়েছে?

-তিনি ৬৭-এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আলিই আমার একমাত্র সন্তান। তাকে নিয়েই আমার সবকিছু আবর্তিত।

আমি এখন আলিদের বাসায় আছি। গত দু-দিন ধরে। ভাইয়া একবার নিতে এসেছিলেন, আমি পড়ার কাজ শেষ হয়নি বলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রতিদিনই খুশিমনে ঘুম থেকে উঠি, আজ বুঝি আলির সাথে দেখা হবে! কিন্তু গিয়ে দেখি, সে নেই। ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে আর আসেনি। প্রায় দিনই আসে না। কোথায় যায়, কী করে, মাকে কিছু বলে না। মা শুধু আক্ষেপ করেন, আমি বিধবা হয়েছি, শহীদের স্ত্রী হয়েছি। এবার বোধ হয় শহীদের মা হতে যাচ্ছি।

পরিবারটা অনেক বড়। অনেক সদস্য। সবাই আমাকে খুবই আদর করে। আগ্রহের সাথে সময় দেয়। এবংশের মেয়েরা স্কুল-কলেজে যায় না, কিন্তু তারা আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের পড়াতে পারবে। আগে মনে করতাম, তারা পড়ে না। এখন দেখি সম্পূর্ণ উল্টো। আমরা খ্রিষ্টানরাই পড়ি না। তারা কী পরম মমতায় কুরআন তিলাওয়াত করে। আমরা কি এত যত্ন করে বাইবেল পড়ি?

আমার কী হয়েছে কী জানি! লাইব্রেরিতে পড়ার চেয়ে আলি আম্মুর সাথে কথা বলতে বেশি ভালো লাগে। তার সাথে অল্পসময় কথা বললে, কয়েকটা বই পড়ার চেয়েও বেশি কিছু জানতে পারি! আমার চেয়ে বয়সে ছোট মেয়েরাও অনেক কিছু জানে। অথচ তারা জীবনেও স্কুলের গণ্ডি মাড়ায়নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২৮ মার্চ, ১৯৭৪

আজ গিয়ে শুনি আলি চলে গেছে। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কেন? একবার মাত্র কথা বলা মানুষের প্রতি আমার এত আগ্রহ কেন? আর যে মানুষটা আমাকে এড়িয়ে চলেছে দিনের পর দিন, আমি কথা বলতে গিয়েছি, নানা অজুহাতে পাশ কাটিয়ে গেছে! তার জন্যে আমার মন কেন উতলা হবে? কোনও যুক্তি আছে?

বাড়িটাকে আমি বড় ভালোবেসে ফেলেছি। আদব-আখলাক, চাল-চলন— সবই ভালো লাগে। তাদের দেখাদেখি আমারও এখন মুখ খুলে বের হতে লজ্জা লাগে। সংকোচ বোধ হয়। আলির আম্মু একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন:

-তুমি আখতালের কবিতা পছন্দ করো! ইমরাউল কায়সকে খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়ো, খলীল জিবরান ও তার বান্ধবী মাই যিয়াদার কবিতাও পড়ো! তুমি কি জানো, এর চেয়েও সুন্দর কবিতা আরবীতে আছে?

-জি না, তিনি কে?

-আমি যে সাহিত্যের কথা বলছি, সেটা ঠিক কবিতা নয়, তবে পড়লে কবিতার চেয়েও হাজারগুণ বেশি আনন্দ পাবে! তৃপ্তি পাবে! তুমি আগ্রহী থাকলে 'ইনশাদ' (আবৃত্তি) করে শোনাতে পারি! ভালো না লাগলে শুনবে না!

-ভালো লাগবে না কেন? আপনার মুখে আমার দুনিয়ার সবচেয়ে অসুন্দর কথাটাও সুন্দর লাগবে!

-হুম! আখতালের কবিতা পড়ে পড়ে তোমার দেখি প্রশংসায় 'ইতরা'(বাড়াবাড়ি) করার অভ্যেস হয়ে গেছে!

-জি না। আপনাকে আমার কেন যে এত ভালো লেগে গেছে, বুঝতে পারছি না। দেখুন না, আমি এখন এবাড়িতে এলে কুতুবখানার চেয়ে আপনার কাছেই বেশি সময় কাটাই! মনে হতে থাকে, কী হবে নীরস কাগজের খসখসে পাতা উল্টিয়ে? তার চেয়ে আপনার জীবনঘেঁষা টসটসে কথাগুলোই আমাকে বড্ড বেশি টানে!

***

আলির আম্মু আমাকে কুরআন কারীম থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। কী আর বলব! এত সুন্দর! এত সুন্দর! শুধু কথাগুলোই নয়, তার গলাটাও খুউব সুরেলা, কথা বলার সময় টের পাইনি। আমি তার মুখ থেকে কুরআন শুনে বিমোহিত! আমি ছোট বেলা থেকে জেনে এসেছি, কুরআনে শুধু আমাদের ধরে ধরে যবাই করার কথা আছে! আর কিছু নেই! কিন্তু সূরা ত্বহা না কী যেন পড়লেন! এত সুন্দর করে কোনও মানুষ বলতে পারবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

লিখতে পারবে না। আমি আরবী সাহিত্যের সেই প্রাচীন যুগ থেকে এ পর্যন্ত বহু কবির কবিতা পড়েছি। শুধু কুরআনটাই পড়া বাকি ছিল। ভয়ে ও ঘৃণায় পড়া হয়নি। ভুল হয়েছে! বড় ভুল হয়েছে!

***

২ এপ্রিল, ১৯৭৪

অনেকদিন পর লিখতে বসলাম। ভার্সিটিতে পরীক্ষা ছিল। আব্বু অসুস্থ। ভাইয়ার সাময়িক নিরুদ্দেশ অবস্থান। সবমিলিয়ে দম ফেলার ফুরসত পাইনি। ভাইয়াটা দিনদিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সব সময় ইহুদীদের সাথে তার ওঠাবসা! আম্মুও ভাইয়াকে সমর্থন করেন। আব্বু অবশ্য ইহুদীদের দু- চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু আম্মু মনে ব্যথা পাবেন বলে কিছু বলেন না। আম্মু কেন যে ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, বুঝতে পারি না। তার পরদাদু ইহুদী ছিলেন বলে? কী জানি! যাক, সময়গুলো খুবই ব্যস্ততায় কেটেছে। সামনে লম্বা ছুটি। মনের সুখ মিটিয়ে পড়াশোনা করা যাবে। আম্মু আমাকে আলিদের বাড়িতে যেতে দিতে চান না। আমি নাকি কেমন হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। আব্বু কৌতুক ভরে জানতে চাইলেন:

-কেমন হয়ে যাচ্ছে মানে?

-আমিও সেটা বুঝতে পারছি না। আগের মতোহইহুল্লোড় করে না। প্রতিবেশী খালাতো ভাইদের সাথে মেশে না। ঘরের বাইরে যায় না। অগের তুলনায় কেমন যেন ভারিক্কি চালচলন!

-এতে তুমি খারাপের কী দেখলে?

-ভারিক্কি ভাব আসা ভালো! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তার ওপর মুসলমানদের প্রভাব পড়ে গেল কি না? আমার মনে হয় তার ওদিকে না যাওয়াই নিরাপদ!

-সে কি ছোট খুকি? তার একটা বুঝ-সমঝ নেই!

আচ্ছা কথা তো! আমি কি আসলেই বদলে গেছি? কই না তো! কিন্তু ভার্সিটির বন্ধু-বান্ধবরাও তা-ই বলল! থাক এসব অপ্রয়োজনীয় চিন্তা। আমাকে যে করেই হোক সে বাড়িতে যেতেই হবে। উফ! কত দিন যাই না! মনে হচ্ছে যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে গেছে! আজ যাবই! ও বাড়ি আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে!

***

৫ এপ্রিল ১৯৭৪

আজকাল লিখতে ভালো লাগে না। ঘরে থাকতে ভালো লাগে না। সারাক্ষণ মনে হতে থাকে, আমার মধ্যে কী যেন নেই! আলিদের বাড়িতে গেলে, সেই নেই নেই ভাবটা উধাও হয়ে যায়! কেন? আলি এসেছিল এরমধ্যে একবার! ভেবেছিলাম কথা হবে! কিন্তু তার ভাব-গম্ভীর অবস্থা দেখে, নিজেরই কথা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলার মতি হলো না। আর ওবাড়িতে নারী-পুরুষ সামনাসামনি কথা বলে না। আমি কেন নিয়ম ভাঙব। তবে গির্জা নিয়ে পড়াশোনা কত কী হয়েছে জানি না, আমি এখন কুরআন পড়ছি! আলির আম্মুর কাছে! ভার্সিটির নাম করে, গির্জার নাম করে, তার কাছে ছুটে আসি। কুরআন পড়তে, গল্প করতে। কবিতাও পড়া হয়। আলির আম্মুই আমাকে একদিন হুট করে বললেন:

-বৈরুত যাবে?

-বৈরুত! কেন?

-না, এমনিতেই!

-আপনি কারণ ছাড়া কোনও কথা বলার মানুষ নন!

-আসলে, প্রশ্নটা আমার নয়, আলির!

-আলির? তিনি আমাকে নিয়ে ভাবেন? ভাবার সময় পান? আমার কথা তার মনে আছে?

-কেন মনে থাকবে না। অবশ্যই মনে আছে! তোমার ভালোমন্দ নিয়ে সে অনেক ভাবে!

-কখনো বলেনি তো!

-প্রয়োজন হয়নি, তাই বলেনি। এখন তার মনে হয়েছে, তোমার এখানে থাকার চেয়ে বাইরে থাকা বেশি ভালো, তাই বলেছে! তোমার আব্বু রাজি হলেও, তোমার আম্মু ও ভাই রাজি হবে না!

-ভাইয়া কেন রাজি হবে না?

-তুমি তোমার ভাইকে কতটুকু চেন?

-ইদানীং তার চলাফেরা কিছুটা সন্দেহজনক হলেও, মানুষ হিশেবে তিনি খুবই ভালো!

-তুমি বোন হিশেবে তাকে ভালো বলবে, এতে দোষের কিছু নেই! কিন্তু তার আসল পরিচয় কী, সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তুমি কি জানো, তোমার ভাই আলিকে হন্যে হয়ে খুঁজছে?

-কই না তো!

***

৬ এপ্রিল ১৯৭৪

গতকাল আলির আম্মুর কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম! ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম! ভাইয়া আলিকে খুঁজছে? কই ভাইয়া কখনোই আমার কাছে আলি সম্পর্কে জানতে চায়নি। সে যে আলিকে চেনে, তার ভাবভঙ্গিতেও আভাস পাইনি। আলির আম্মু বোধহয়, হঠাৎ মুখ ফস্কে ভাইয়ার প্রসঙ্গ এনে ফেলেছিলেন। আমি পাল্টা প্রশ্ন করতেই তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সংবিৎ ফিরে পেয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলেছেন। শুধু এটুকু বলেছেন, সময় হলে আমাকে সব বলবেন। তা হলে কি ভাইয়ার অন্য কোনও পরিচয় আছে! যা আলিদের জন্যে বিপজ্জনক? খোঁজ নিতে হবে! ভাইয়া টের না-পায় মতো করে!

***

আলি কেন আমি বৈরুত যাব কি না জানতে চাইল? সে কি চায় আমি বৈরুত যাই! ওখানে উচ্চতর পড়াশোনা করি! ওখানে আমার এমনিতেই যাওয়া হবে! বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে আব্বু পড়েছেন, দাদু পড়েছেন! ভার্সিটিতে দাদুর বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাস ও প্রাচ্যবিদ ফিলিপ খুরি হিট্টি (১৮৮৬-১৯৭৮)। *হিস্ট্রি অব আরব*-এর লেখক! দাদু বন্ধুর বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করেছেন। আব্বুও হলে সিট পাওয়ার আগে হিট্টি দাদুর বাড়িতে ছিলেন। তার বাড়ি ছিল বৈরুত থেকে পঁচিশ কিমি দূরে। শেমলানে। আব্বু যখন বৈরুতে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন, তখন হিট্টি দাদু আমেরিকায়! প্রিন্সটন আর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তিনি না থাকলে কী হবে, দুই পরিবারের সম্পর্কটা দৃঢ় একটা ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমি বৈরুতে গেলে ওখানেই উঠব! দেখা যাক কী হয়!

একটা বিষয় আমার কাছে বেশ অবাক লাগে, আমরা হলাম আর্মেনিয়ান চার্চের অনুসারী। অর্থোডক্স খ্রিষ্টান। আর ফিলিপ দাদুরা হলেন ম্যারোনাইট। তার মানে ক্যাথলিক খ্রিষ্টান! দাদুদের সেই আমলে দুই দলের মধ্যে চরম রেষারেষি বিদ্যমান ছিল! তবুও তাদের বন্ধু হতে সমস্যা হয়নি।

***

৭ এপ্রিল ১৯৭৪

গতকাল আলিদের বাড়ি যেতে পারিনি। আব্বু আমাদের সবাইকে এক আন্টির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। নাসিরায় (الناصرة) ইংরেজিতে নাজারেথ!। পাশাপাশি মা মেরি ও যেসাস ক্রাইস্টের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো আবার ঘুরে ফিরে দেখাও উদ্দেশ্য ছিল। নাজারেথে আন্টির নানাবাড়ি! শহরটা আগের মতো নিরিবিলি নেই। সারা বিশ্ব থেকে সব মতবাদের খ্রিষ্টানরা দলে দলে শহরটা দেখতে আসে। মুসলিমরাও শহরটাকে পছন্দ করে। তাদেরকুরআনেও এশহরের ঘটনা আছে। এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল মা মেরিকে এখানেই পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন! আরও নানা ঘটনা!

***

আন্টি অনেক বড় মানুষ! রোজমেরি সাঈদ। তিনি থাকেন আমেরিকায়। বড় ভাই এডওয়ার্ড সাঈদের মতোই গুণী। ইংরেজি ও আরবী উভয় ভাষাতেই তাদের লেখা বুদ্ধিজীবীমহলে সমাদৃত। তাদের মূল বাড়ি ফিলিস্তিনে হলেও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পিতার সূত্রে মার্কিন নাগরিক। তাদের বাবা সাঈদ ওয়াদী অনেক আগে থেকেই আমেরিকায় বাস করে আসছেন। রোজমেরি আন্টি মাঝেমধ্যে দাদার বাড়ি ও নানার বাড়িতে বেড়াতে আসেন।

আব্বু মূলত সাঈদ আঙ্কেলের ক্লাসফ্রেন্ড। কুদসের বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল 'আলমুতরানে' দুজন একসাথে পড়াশোনা করেছেন। সে সূত্রেই আন্টির সাথে পরিচয়। আন্টিও 'মুতরানে' ভর্তি হয়েছিলেন।

দাদুর সূত্র ধরে আমাদের সাথে লুবনানের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। রোজমেরি আন্টির আম্মুর জন্ম নাজারেথে হলেও, তার পূর্বপুরুষ এসেছিলেন লুবনান থেকে। এজন্যে আন্টির আম্মু আমার আব্বুকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি বলতেন:

-ওর শরীরে আমার বাবার বাড়ির গন্ধ লেগে আছে! তাকে দেখলে পূর্বপুরুষদের কথা মনে পড়ে!

আব্বু আর আন্টির মধ্যে চমৎকার একটা সম্পর্ক আছে! আম্মুর মধ্যে এনিয়ে চাপা 'কুনকুনি' আছে বোধ হয়! আন্টি যদি আমেরিকা চলে না যেতেন, তা হলে আন্টি হয়তো আমার মা হতেন। এখনো তিনি আমাকে কাছে পেলে যেভাবে গভীর আবেশে আদর করেন, তাতে মনে হয়, আমি তার গর্ভের সন্তানের চেয়ে কোনও অংশে কম নই! রোজমেরি আন্টি আমেরিকা চলে গেলেও, বিয়ে করেছেন একজন ফিলিস্তিনিকে। টনি যাহলান। তার বাড়ি এখানেই। হাইফায়।

***

এডওয়ার্ড সাঈদ আঙ্কেলের সাথে আব্বুর নিয়মিত যোগাযোগ হয়। চিঠিতে। ফোনে। আব্বুর মধ্যে চাপা গর্বও কাজ করে, তার ছোটবেলার বন্ধু আর বান্ধবীকে আজ বিশ্বজোড়া মানুষ এক নামে চেনে। আমাদের কাছে তাদের কত গল্প শোনান। আঙ্কেলের *ওরিয়েন্টালিজম* বইটা বলতে গেলে আব্বুর একপ্রকার মুখস্থ! বন্ধুর প্রতি এমন ঈর্ষাহীন শ্রদ্ধা সচরাচর দেখা যায় না! আব্বু আমাকে ছোটবেলায় বলতেন, তোকে আন্টির মতো হতে হবে! আম্মু ঝামটা দিয়ে বলে উঠতেন, দরকার নেই আন্টির মতো হওয়ার। আমার মেয়ে হবে আমার মেয়ের মতোই! আন্টি কিছুদিন বৈরুতের আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন। আব্বুও চাইতেন আমি ভালোভাবে পড়াশোনা করে ওখানে লেকচারার পদে সুযোগ লাভ করি! বারবার শুনতে শুনতে আমার মধ্যেও এধরনের একটা স্বপ্ন চারিয়ে গিয়েছিল! আমাদের পরিবারের একান্ত চাওয়ার বিষয়টাই যখন আলির চাওয়ার সাথে মিলে গেল, সেজন্যে চমকে গিয়েছিলাম। অবশ্য আলির চাওয়া আর আমাদের পরিবারের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চাওয়া বোধহয় এক নয়! সে কেন আমার বৈরুত যাওয়ার কথা জানতে চাইল? ওর সাথে একবার সরাসরি কথা বলতে পারলে ভালো হতো! কিন্তু তার টিকিটির নাগাল পাওয়াই তো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে!

***

আজ আলিদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ছিলাম। আলি আমার জন্যে খলীল জিবরানের অনেকগুলো বই এনেছে। তার প্রিয় কবি আহমাদ শাওকীর *দীওয়ান* এনেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে আম্মুর প্রিয় কবি 'মাই যিয়াদা' (مي زيادة)-র কবিতার বই এনেছে! কী মনে করে খলীল জিবরানকে লেখা মী যিয়াদার চিঠির একটা সংকলনও এনেছে! উপহারের স্থানে আম্মুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে:

'একজন গুণী মানুষের বই, আরেক জন গুণী পাঠকের জন্যে'!

আম্মু মন্তব্যটা পছন্দ করেছেন। আলাদা করে জানতে চেয়েছেন আলি সম্পর্কে। আমার জন্যে নিয়ে আসা 'শাওকিয়্যাতে' আলি লিখেছে:

যিয়াদাহ!

'তোমার অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎটা বেশি আলোকিত হোক, দিনদিন তোমার আলো 'যিয়াদাহ' হোক'!

মন্তব্যটা আম্মুর চোখে পড়েছে! তিনি পড়ার পর ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ কী যেন ভেবেছেন! আমার দিকেও আড়চোখে তাকিয়েছেন! তিনি কি কিছু একটা সন্দেহ করছেন? আমার মনেও একটা প্রশ্ন কুনকুন করছে, আলি কি কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে কথাটা লিখেছে? তার সবকিছুই কেমন যেন হেঁয়ালি ভরা! আমার সাথে কথা বলে না, দেখা করে না, অথচ আমার সব খবর তার নখদর্পণে! তার সাথে পরিচয়টা এত সুন্দরভাবে হলো! সেটা আরও কত সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারত! অথচ তার কোনও হেলদোলই নেই! কেমন গা-ছাড়া ভাব।

***

কবিতার বই আর চিঠির সংকলনটা পেয়ে আম্মুর আনন্দ আর ধরে না। চিঠিগুলো বারবার পড়ছেন। আব্বু চান আমি ভার্সিটির অধ্যাপক হই! আম্মু চান, আমি যেন তার প্রিয় কবির মতো এক পরিপূর্ণ কবি হই! আমার নাম রাখা নিয়েও আব্বু-আম্মুর সে কী মন কষাকষি! আব্বু চেয়েছিলেন, আমার নাম হবে 'রোজমেরি'। সংগত কারণেই আম্মু রেগে কাঁই! আব্বু বুদ্ধিমান মানুষ! আপসের পথে হাঁটলেন! আম্মু তার প্রিয় কবির নামেই আমার নাম রেখেছেন। নামটা আমারও বেশ পছন্দের! আব্বু যখন আমাদের নিয়ে নাজারেথে গেলেন, রোজমেরি আন্টির বাসায়, আম্মু সেখানে যেতে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। শুধু ভদ্রতারক্ষার্থে গেলেন। আম্মুর আগ্রহ অন্যখানে! মী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যিয়াদার বাড়ির দিকেই আম্মুর আগ্রহ! কবির বাড়িও এ পবিত্র শহর নাজারেথেই! আম্মুর মধ্যে বোধহয় একধরনের হতাশা কাজ করে, তার মধ্যেও কবি হওয়ার প্রবণতা ছিল। সেটা চরিতার্থ করতে না পেরে, অন্যের মাঝে ও মেয়ের মাঝে সে প্রতিচ্ছবি খুঁজে বেড়ান!

***

১০ এপ্রিল, ১৯৭৪

প্রতিজ্ঞা করি প্রতিদিনই দিনলিপিতে কিছু না-কিছু লিখব! সেটা আর হয়ে ওঠে না। লিখতে বসলেই রাজ্যের ঘুম এসে দু-চোখে ভর করে। নানা কাজের কথা মনে পড়ে যায়! লেখার চেয়ে লেখার বিষয় নিয়ে ভাবতেই ভালো লাগে! নেশা নেশা লাগে! এই যে গতকাল আলিদের ওখানে গিয়েছিলাম। অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটেছে। কত্তদিন পর দেখলাম আলিকে! আলির আম্মু বলেছেন:

-আলি আর এখানে আসতে পারবে না। তুমি লুবনানে যাবে বলেছিলে না! তুমি গেলে তার ভালো লাগবে! তোমার কোনও সহযোগিতা লাগলেও সে করতে পারবে! ভার্সিটিতে ভর্তি ও থাকা-খাওয়ার সুন্দর বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে! তুমি চাইলে মুসলিম বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে, খ্রিষ্টান বাড়িতেও করে দিতে পারবে!

-আমার থাকার ব্যবস্থা আছে!

-সেই ফিলিপ খুরীদের বাড়িতে? আলি বলেছে, তাদের বাড়ি শেমলানে। বৈরুত থেকে ২৫ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে! এতদূর আসা-যাওয়া করতে পারবে নিয়মিত? তোমার কষ্ট হয়ে যাবে না? এজন্যেই আলি ভিন্ন ব্যবস্থার কথা ভেবেছে!

-আচ্ছা, আমি এবিষয়ে পরে জানাব! আলি এখানে আসতে পারবে না কেন?

-নিরাপত্তাজনিত কারণে। তাকে ইহুদী গোয়েন্দারা খুঁজছে! বৈরুতেও তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়!

-আলি কি গোপন কিছুর সাথে জড়িত?

-যাদের পিতা বা কোনও আত্মীয় ইসরায়েলবিরোধী যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, তাদের একটা তালিকা আছে। এদের সব সময় দেখে দেখে রাখা হয়। তারা প্রতিশোধমূলক কিছু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না, যাচাই করে দেখা হয়। তা ছাড়াও আলির স্বাধীনচেতা যুবক! তার চিন্তা আমাদের পরিবারের বাকি দশজনের চেয়ে আলাদা! সবাই যেখানে ইহুদীদের সাথে আপস করে থাকতে আগ্রহী, আলি সেখানে ইহুদীদের একচুল ছাড় দিতে নারাজ! এজন্যেই তার দাদা তাকে বৈরুত পাঠিয়ে দিয়েছে! এখানে থাকলে বেঘোরে বুলেটের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আঘাতে মারা পড়ে! কিন্তু ওখানে পাঠিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে! যে ভয় থেকে বাঁচার জন্যে তাকে বৈরুত পাঠানো হয়েছে, সেখানে ভয়টা আরও বেশি করে দেখা দিয়েছে! সে এখন আত্মগোপন করে থাকে! লুকিয়ে থেকেই সে অনেক কাজ করে! এখনো পর্যন্ত গোয়েন্দারা তার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য পায়নি! শুধু সন্দেহ করে! নইলে আরও আগেই ধরে ফেলত! এসব কথা এখন থাক। আলি তার দুটো ইচ্ছার কথা আমাকে বলেছে। তোমাকে বলতে বলেছে!

-কী ইচ্ছা?

-একটা ইচ্ছে হলো, তুমি এখনই বৈরুত না গিয়ে আরও কিছুদিন পরে যাবে! ততদিন নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসার চেষ্টা করবে! আমাদের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে যাবে! পাশাপাশি পড়াশোনাও করবে!

-এটা তো এখনো করছি! আলাদা করে ইচ্ছেটা কেন প্রকাশ করল?

-তোমার প্রশ্নের উত্তরটা আলির দ্বিতীয় ইচ্ছের মধ্যে আছে!

-দ্বিতীয় ইচ্ছেটা কী?

-সেটা এখন বলা যাবে না! সময়-সুযোগমতো পরে বলব! অথবা বলার প্রয়োজন হবে না! তুমিই বুঝে নেবে!

-ঠিক আছে!

***

০৯ জুন ১৯৭৪

আমি এখন বৈরুতে। গতকাল এসে পৌঁছেছি। পরিবারের সবাই এসেছে। ভেবেছিলাম ভাইয়া আসবে না। ধারণা ভুল প্রমাণ করে তিনিও এসেছেন। বৈরুতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছি। গত দুমাস তুমুল যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গেছে। ঘরে-বাইরে উভয় স্থানে। মুসলমানদের সাথে ইসরায়েলি সেনাদের সংঘর্ষে পরিস্থিতি আগুনের মতো হয়ে গিয়েছিল। নিয়মিত আলির আম্মুর কাছে যেতে পারিনি। গত একমাস ঘর থেকেই বের হতে দেননি আব্বু-আম্মু। ভাইয়া তাদের কী বুঝিয়েছেন কে জানে! তারা আমাকে ও বাড়িতে যেতে দেননি। দ্রুত বৈরুত আসার তোড়জোড় করেছেন। মনটা বড় বেশি জ্বলছে, আলির মায়ের সাথে দেখা করে আসতে পারলাম না। বিদায় নিয়ে আসতে পারলাম। অনেক অসম্পূর্ণ কথার পূর্ণতা দিতে পারলাম না। আলির প্রথম ইচ্ছানুযায়ী আমি তার মায়ের সাথে থেকেছি! কখনো কখনো রাতেও থেকেছি। বাড়িতে মিথ্যা বলতে হয়েছে মাঝেমধ্যে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না। মহিলার মধ্যে মা মা ভাব ছাড়াও এমন একটা কিছু ছিল, চুম্বকের মতো টানত! যে কয়দিন যেতে পেরেছি, তিনি আমাকে গল্পচ্ছলে অনেক কথা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলেছেন। কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন। মুখস্থ! অবাক কাণ্ড! তার পুরো কুরআনই কণ্ঠস্থ! আমি বাইবেলের দুয়েকটা লাইন ছাড়া বেশি কিছু পারি না! অল্প কদিনের মধ্যে তিনি আমার কাছে পুরো ইসলাম তুলে ধরেছেন। খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন। আশ্চর্য, একটা মানুষ সারাজীবনে পর্দার আড়ালে থেকে, এতকিছু কীভাবে জানলেন! কীভাবে শিখলেন? প্রশ্নটা করেছিলাম তাকে! তিনি মিষ্টি হেসেছেন! কিছু বলেননি। পরে একদিন বলেছিলেন, স্বামী শহীদ হওয়ার পর অনেক প্রস্তাব এসেছিল, তিনি গ্রহণ করেননি। সন্তানের পেছনেই বাকি জীবন ব্যয় করবেন বলে ঠিক করেছেন। পড়াশোনা করবেন, এতিম শিশুদের শিক্ষার জন্যে কাজ করবেন। মসজিদুল আকসায় মেয়েদের কুরআনবিষয়ক হালকা হয়, সেগুলোতে সময় দেবেন। এর সবগুলোই তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। আমার কাছে অবাক লেগেছে, মেয়েদেরও কুরআনি হালকা হয়?

-কেন হবে না! কুরআন শিক্ষা করা, ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর সমানভাবে ফরয!

-আমি দেখতে যেতে পারব?

-নিয়ে যাব একদিন তোমাকে!

-আপনাদের কে পড়ান?

-কেউ পড়ায় না! আমরাই পড়ি! ওখানে যারা আসেন, সবাই শিক্ষিত! পুরুষদের অনেক সময় ইহুদী সেনারা প্রবেশ করতে দেয় না, তাই নারীরাই মসজিদে আকসায় কুরআন-শিক্ষার ধারা অব্যাহত রেখেছে! তাদের কারও কারও কুরআনি জ্ঞান দেখলে হয়রান হয়ে যাবে! আমাদের প্রামাণ্য যুগের বড় বড় তাফসীরের কিতাব তাদের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ! একটা আয়াত বললে, সেটার তাফসীর, কয়েকটা কিতাব থেকে মুখস্থ বলে দেয়।

-আমাদের বাইবেল নিয়ে এমন কিছু কল্পনাও করা যায় না।

***

তিন দিন পর মসজিদে আকসায় গেলাম। ভেবেছিলাম এত বাধা ডিঙিয়ে কজনই-বা আসবে! ওখানে গিয়ে দেখি মহিলা গিজগিজ করছে। সবার হাতে কুরআন শরীফ আর খাতা। একটা আয়াত পড়া হচ্ছে, বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে আয়াতটা সম্পর্কে যা লেখা আছে, যার যার সাধ্য অনুযায়ী বলে দিচ্ছে। সবই মুখস্থ। আলির আম্মুকে দেখলাম অনেকগুলো তাফসীর থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। কেউ মুখস্থ বলার সময় ভুল করলে, সংশোধন করে দিচ্ছেন! তাদের মুখ থেকে শুনতে শুনতে অনেক কিতাবের নাম মুখস্থ হয়ে গেছে! পুরো সময় জুড়ে শুনছিলাম আর ভাবনার অতলে ডুবে যাচ্ছিলাম, এদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মধ্যে এত জ্ঞানচর্চা, তবুও পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে কেন? ঘোরের মধ্যে সেদিনের কুরআনি হালকা শেষ হলো। ভীষণ অতৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফিরলাম। ভেতরের ছটফটানি দেখে বুঝতে পারলাম, আমাকে আবার যেতে হবে ওই অপার্থিব জ্ঞানচর্চার হালকায়! মহিলারাও নিজ ধর্ম সম্পর্কে এত এত জানে? এতকিছু মুখস্থ রাখা সম্ভব? এত সুন্দর করে বিতর্ক করা যায়? রাগারাগি না করে? গলার স্বর উঁচু না করে? কেউ নিজের জ্ঞান জাহির করতে চায় না। পারলে বিনয়ের সাথে বলে দেয়, না পারলে অন্যের কাছ থেকে শুনে নোটবইতে টুকে নেয়। এরা কেন এত গুরুত্ব দিয়ে পড়ছে? পরীক্ষা দেবেন? নাহ! এটা নিখাদ জ্ঞানচর্চা! অহেতুক গল্পগুজব আড্ডা নয়। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে চা-পানের বিরতি হয়! তখন গল্পগুজব হয়। অকাজের কথা নয়, সবই কাজের! এতদিন আলির আম্মুর কাছে গল্প শুনে ইসলামের প্রতি আমার যতটা দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল, এখানে কুরআনি হালকায় একদিন এসেই তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দুর্বলতা তৈরি হয়েছে। নিজের চিন্তা-বিশ্বাসকে অসার ঠুনকো আর খেলো মনে হতে লাগল!

***

বিপদ দেখা দিলো দ্বিতীয় দিন। হালকা থেকে ফেরার সময় ভাইয়া আমাকে দেখে ফেলেছে। তারপর থেকেই আমি একপ্রকার গৃহবন্দী! তার রেশ ধরেই এখন বৈরুতে! কুরআনি হালকার মিষ্টি আমেজে আমি আলির কথাও ভুলতে বসেছিলাম। দুদিন হালকায় বসে, যা যা শুনেছিলাম, বেশির ভাগ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কী সুন্দর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ! খটমটে রসকষহীন কোনও জোরজবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেয়া মতামত নয়! ভদ্রমহিলাদের প্রতিটি কথাই যুক্তিসংগত আর গ্রহণযোগ্য লেগেছে! ত্রিত্ববাদের ধাঁধালো কুহেলিকার লেশমাত্র নেই!

***

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

ভার্সিটিতে ভর্তির কাজ শেষ হয়েছে সেই কবে! যখনই বাইরে বের হয়েছি, দুচোখ শুধু একজনকে খুঁজে বেরিয়েছে! এত লোকের ভিড়ে কাউকে পাওয়া কি সম্ভব? ভার্সিটিতেও কতজনকে জিজ্ঞেস করেছি। আমাদের ফিলিস্তিনের অনেক ছেলে-মেয়ে পড়ে। তাদের কাছে আলির কথা জানতে চেয়েছি, কেউ চেনে না। দিনগুলো পানসে হয়ে কাটছে। প্রতিদিনই আশায় বুক বাঁধি, আজ বোধহয় দেখা হবে! দিন শেষ হয়ে যায়! আবার নতুন আশা নিয়ে ভোর আসে। এখন দিন-তারিখের হিশেব থাকে না। আজ ঘরে ফিরছিলাম! বাসে নিজ আসনে বসে আছি! জানলা দিয়ে একটা কাগজ এসে কোলের ওপর পড়ল। চমকে উঠলাম! খুলে দেখি আলি হাতের লেখা! বুকের রক্ত ছলকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উঠল! মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল! দ্রুত মাথা বের করে দেখলাম! তেমন কাউকে চোখে পড়ল না! কাগজটাতে পরিচিত হস্তাক্ষর জ্বলজ্বল করছে :
“দ্বিতীয় ইচ্ছেটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? পারলে আগামী আটাশ তারিখে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আসবেন! শেষ গন্তব্য পর্যন্ত বাসে বসে থাকবেন।”
পুরো রাস্তা জুড়ে উথাল-পাতাল চিন্তা! দ্বিতীয় চিন্তা কি বিয়ে নাকি মুসলমান হওয়া? অথবা উভয়টা? যেটাই হোক, আমি সবটাতে রাজি! সেই কবে থেকে! আলির আম্মুকে সবকিছু খুলে বলার সুযোগ না পেলেও, তিনি আভাসে-ইঙ্গিতে অনেক কিছুই ধরতে পেরেছেন। কিছু বিষয় জিজ্ঞেস করেও জেনেছেন। আমার মধ্যে দ্বিধার কিছু ছিল না। আরেকবার কুরআনি হালকায় যেতে পারলে, এতদিন অপেক্ষা করতে হতো না। আরও কয়েকমাস আগেই অনেক কিছুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতাম! এখন শুধু প্রতীক্ষা!

***

৪ নভেম্বর, ১৯৭৪

দীর্ঘদিন পর কলম নিয়ে বসলাম! স্মৃতিগুলো ধরে রাখা যাক! চিরকুট পাওয়ার রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না! এমন প্রতীক্ষার রাতে কারও ঘুম আসে! এপাশ-ওপাশ করে রজনী কেটে গেল। ভোরে উঠেই মনে হলো, এখনই বেরিয়ে পড়ি! আবেগ দমন করতে হলো! এত আগে বের হয়ে কী লাভ! যেতে হবে তো ভার্সিটির পর! একেকটা সেকেন্ড যেন একেক ঘণ্টা! ফুরোতেই চায় না! সময়মতো বাসে উঠে বসলাম! চোরা চোখে আশেপাশে দেখছি! না, তেমন কেউ নেই! সবাই ভার্সিটির প্রতিদিনের যাত্রী! মনে হয়, শেষ স্টপেজেই আমার অপেক্ষা করবে! বাস চলছে! থামছে! আমাদের বাসে যাত্রী ওঠে না, শুধু নামে! শেষের দিকে বাস প্রায় খালি হয়ে গেল! পুরো বাসে গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রী। বাস থামল! একজন ছাত্র নামবে! কোত্থেকে যেন কাগজের একটা দলা এসে পড়ল! দ্রুত খুলে ফেললাম :
“মেয়েটির সাথে চলে আসুন।”
কোন মেয়ে? বাসে সবমিলিয়ে আছে তিনটি মেয়ে! এদের কারও সাথে? বাস আবার ছেড়ে দিয়েছে! হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি! যা হওয়ার হবে! আরও তিনটা স্টপেজ বাকি আছে! অন্যমনস্ক হয়ে বসে বসে ভাবছি! বৈরুত এখনো আমার কাছে নতুন! জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি! বাস আবার থামল! কে একজন বলল :
-যিয়াদাহ, নেমে পড়ো!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কথাটা কে বলল সেটা দেখার অপেক্ষা করলাম না! নেমে গেলাম! উত্তেজনার পাশাপাশি অন্য রকম এক আনন্দ হচ্ছিল! এতদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে! কত কতদিন পর তাকে দেখব! তার সাথে কথা বলব! মুখোমুখি হব অদ্ভুত মানুষটার! অপরিচিত থেকে অতি আপনজনে পরিণত হবে! বাস থেকে নামতে নামতেই মাথায় এসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল! বাস চলে গেছে! বোরকা পরা এক মহিলা এসে, মৃদুস্বরে প্রশ্নের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল :

-যিয়াদাহ?

-জি!

আমি উত্তর দেয়ার আগেই, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল! একটু পর হাত ছেড়ে দিয়ে আপন গতিতে হাঁটতে লাগল! যেন আমাকে চেনেই না। আমার ভারি আমোদ হচ্ছিল! কেমন গোয়েন্দা গোয়েন্দা ভাব! নানা পথ পাড়ি দিয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলাম! বোরকা পরা মেয়েটা আমাকে দ্রুত পোশাক বদলে নিতে বলল! একটা বোরকা দিলো! পরে নিলাম! সবকিছু একদম মাপমতো হয়েছে! মনে পড়ল, আলির মা আমার জামা-কাপড়ের মাপ নিয়েছিলেন একবার! সেটা তা হলে এ জন্য! ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলাম :

-আলি কোথায়?

-আছে! একটু পরেই দেখা হবে!

বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে আবার বের হয়ে এলাম। আবার দীর্ঘক্ষণ হাঁটার পর, একটা ঘরে এসে হাজির হলাম। গাঢ় অন্ধকার! হাতড়ে হাতড়ে হাঁটলাম। কেউ একজন এসে আমার হাতটা কোমলভাবে ধরল! সুন্দর করে সাজানো-গোছানো একটা কামরায় প্রবেশ করলাম! উজ্জ্বল আলোতে দেখলাম, অত্যন্ত মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে আমার হাত ধরে রেখেছে! সোফায় বসলাম। একে একে অনেক মহিলা এলেন। আমাকে এত আদর করে আপ্যায়ন করলেন, মনে হলো আমি একজন রানি। আমার চেয়ে বয়েসে একটু বড় একজন আমাকে কালিমা পড়ালেন। সবাই মিলে দু'আ করলেন। আলির সাথে বিয়েতে আমার সম্মতি আছে কি না, জানতে চাইল! মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম! আলির সাথে বিয়ে হলে, কী কী সমস্যা হতে পারে, তার একটা ফিরিস্তি তুলে ধরল!

-বাবা-মায়ের সাথে বাকি জীবন দেখা হওয়া অনিশ্চিত!

-ইসলাম গ্রহণ করার পর, এমনিতেই সেটা অনিশ্চিত হয়ে গেছে!

-সব সময় গোপন জীবনযাপন করতে হবে!

-সেটা বিয়ে না করলেও হবে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এমনই আরও কিছু আশঙ্কা তুলে ধরল। আমি জানালাম এসব আমাকে আগেই আলির আম্মু বলেছেন। আমার দিক থেকে কোনও দ্বিধা নেই। এমনকি আমি যেকোনও সময় বিধবা হতে পারি, সেটাও আলির আম্মু বলেছেন!

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম আসল মানুষটার জন্যে। তারই যে দেখা নেই! অবশেষে অবসান ঘটল। তিনি এলেন। তাকে দেখে কানায় কানায় ভরে উঠল। যেন অনেক দিন পিপাসার্ত থাকার পর, পানি পান করলাম! প্রচণ্ড গরম থেকে আরামদায়ক শীতল কক্ষে প্রবেশ করলাম! সালাম দিলেন। উত্তর দিলেন। সবার কথা জানতে চাইলেন। এতদূর হেঁটে আসতে কোনও কষ্ট হয়েছে কি না, বার বার জানতে চাইলেন। জানালেন, তাকে ইহুদীরা হন্যে হয়ে খুঁজছে! আমার ভাইয়ের কীর্তি শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম! সে নাকি রীতিমতো হোমরাচোমড়া গোছের সিক্রেট এজেন্ট। খ্রিষ্টান হয়েও ইহুদীদের হয়ে কাজ করে। মোটা বেতনে।

আলি এরপর মূল প্রসঙ্গে চলে এল। তার কিছু সমস্যা তুলে ধরল। বললাম এসব আমি আগে থেকে জানি। নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। বিয়ে হয়ে গেলে, আমরা একে অপরের সমব্যথী হয়ে যাব! জীবনসাথি হয়ে যাব! একে অপরের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নেব! প্রয়োজনে জীবনেরও পরোয়া করব না!

বিকেলে বিয়ে হলো আমাদের। রাতেই আমরা আরেকটা বাড়িতে চলে গেলাম। ঠিক হলো আমরা কিছুদিনের জন্যে সিরিয়া চলে যাব! এদিকের পরিস্থিতি শান্ত হলে ফিরে আসব। আলিদের গোয়েন্দারা খবর দিলো, আমি যে বাড়িতে বোরকা পরার জন্যে থেমেছিলাম, সেখানে কারা যেন দরজা ভেঙে ঢুকেছে! শুরু হলো আমাদের লুকোচুরির জীবন। খারাপ লাগছিল না। আলি পাশে আছে! এত ঝুঁকির মধ্যেও আলিরা তাদের ইসরাইল বিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সীমান্ত চৌকিতে অতর্কিতে হামলা অব্যাহত রেখেছে। আমাকে সে সবকিছু খুলে বলত না। আমি আগে বেড়ে জানতে চাইতাম না। আমি শুধু চাইতাম, আলি যেন আমার কাছে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ যেন সুখে থাকে। নিশ্চিন্তে থাকে! আরামে থাকে!

***

১৭ নভেম্বর, ১৯৭৪

আগে ছিলাম একজন। নিজের মতো থাকতাম। এখন দুজন। দুজনের মতো থাকতে হয়। আলি এমন মানুষ, তার সাথে থাকতে কারোরই বিশেষ বেগ পেতে হবে না। অন্যের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তার খুব মনোযোগ! আমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বাবা-মা ছেড়ে এসেছি, তার অভাব বোধ করার সুযোগ পাইনি। আলিদের একটা দল আছে। এদের বেশির ভাগই ফিলিস্তিনি। তাদের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। সমাজ আছে। গোপনে এরা অনেক কাজ করে। লেবানন সরকারকে লুকিয়ে। সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে, গৃহস্থালি কাজ পর্যন্ত সেখানো হয়। ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকেই যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। যাতে তারা মসজিদুল আকসার জন্যে লড়তে পারে। ইহুদীদের হাত থেকে কুদসকে মুক্ত করতে পারে। ইহুদী গোয়েন্দারা আলিদের গোপন দল সম্পর্কে আবছা আবছা জানত। তাই তারা হন্যে হয়ে খুঁজত! কিন্তু আলিদের অতি গোপনীয়তার কারণে ইহুদীরা তেমন একটা সুবিধা করে উঠতে পারত না। এদিকে বৈরুতের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে যুদ্ধ লাগে লাগে অবস্থা। এই ঘোলাটে পরিস্থিতিতে আমাদের একটা লাভ হয়েছে, নিরাপত্তাসংকট কিছুটা হলেও কমেছে। কিন্তু দেখা দিয়েছে নতুন সমস্যা, বৈরুতের খ্রিষ্টান ও শী'আরা ফিলিস্তিনীদের সহ্য করতে পারছে না। বিশেষ করে খ্রিষ্টান মিলিশিয়ারা নানাভাবে মুহাজিরদের উত্ত্যক্ত করছে! আলি মনে করছে আপাতত কিছুদিনের জন্যে বৈরুত ছেড়ে বাইরে থাকা নিরাপদ হবে!

***

১১ মার্চ, ১৯৭৫

অনবরত ছোটাছুটি মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বৈরুতে আর থাকা যাবে না। গৃহযুদ্ধ প্রায় লেগে যাচ্ছে! সীমান্ত পার হওয়া কঠিন কিছু নয়। আলি যেতে চাচ্ছে না। কিন্তু তার উর্ধ্বতন মহল বলছে, সিরিয়াতে গেলে কিছু কাজ হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে, বৈরুতে ফিলিস্তিনীদের ওপর ভয়াবহ হামলা হবে, চতুর্দিক থেকে। তার জন্যে সিরিয়া থেকেও বাড়তি সাহায্য লাগবে। আলি গেলে কাজটা সহজ হবে।

***

৪ মে, ১৯৭৫

সিরিয়ায় এসেছি। কোথাও থিতু হওয়া যাচ্ছে না। আজ হামায় তো কাল হালাবে। পরশু দামেশকে। এভাবে চরকির মতো ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। আলি আমাকে কোথাও রেখে যেতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। আমিও তার সাথে থেকে মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে পারব। আর আমাদের নতুন মেহমান আসবে। এ সময়টা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। এমন কিছু হবে, সেটা আগে থেকেই জানা ছিল। আমার মনে তো এমন আশঙ্কাও ছিল, হয়তো তার সাথে বাসরও হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার এই অসহায় বান্দীর প্রতি অনেক দয়া করেছেন। আমাদের জীবনধারাই এমন, দুজনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটু নিরালায় বসে কথা বলব, সে ফুরসতও মেলে না। শুধু বিয়ের পরে কটা দিন নিরালায় ছিলাম। তাও আলি সারাদিন কোথায় কোথায় চলে যেত। সে চেষ্টা করত রাতটুকু পুরোপুরি আমাকে দিতে। সিরিয়াতে আসার পর, দিনরাত কোন ফাঁকে যে চলে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। আমার কাজ হলো, বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে কথা বলা। বিভিন্ন দেশে অসহায়ভাবে তাঁবুতে বাস করা, ফিলিস্তিনীদের জন্যে অর্থকড়ি সংগ্রহ করা। আলির কাজ হলো, যোদ্ধা সংগ্রহ করা। এর মধ্যেই সময় করে দুজন একান্ত সময় কাটাই।

***

৮ আগস্ট, ১৯৭৫

গত এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে বৈরুতে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অসহায় ফিলিস্তিনীরা চতুর্মুখী আক্রমণের শিকার! পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। কষ্টে বুক ফেটে যায়। আলি মাঝেমধ্যে অস্থির হয়ে পড়ে! ছুটে যেতে চায় সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিতে। কিন্তু তাকে বার বার বাইরের দায়িত্ব দেয়া হয়। যুদ্ধ করার লোক তো আছে। আলি যেভাবে নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে পারে, অন্যরা সেভাবে পারে না। এবার তাকে জর্ডান যেতে হবে। আমাকে সাথে নেবে না বলছে! দেখা যাক!

***

২১ অক্টোবর, ১৯৭৫

আমি এখন দামেশকে থাকি। মুখাইয়ামে ইয়ারমুকে! বিশাল একটা এলাকাজুড়ে অসহায় ফিলিস্তিনীরা মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব। অর্থের অভাব। অনেক কাজ করতে হয়। আলি আমাকে রেখেই আম্মানে গেছে। সেখানেও শিশুদের স্কুলগুলোর বেহাল অবস্থা। আমি গেলে ভালো হয়। আমারও ইচ্ছা, ওখানে যাই। আমার ছোট খালা থাকেন সেখানে। আমাকে খুবই আদর করতেন। কী জানি এখন কীভাবে গ্রহণ করবেন।

***

১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬

ডায়েরিটা ভুলে রেখে গিয়েছিলাম। আলি বলেছিল কদিন পরেই আবার দামেশকে ফিরে আসব। তাই প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় ছাড়া আর কিছু নিইনি। আম্মানের দিনগুলো ছিল বৈচিত্র্যময়। এই প্রথম একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে দেখা হলো। ছোট খালা আশাতীত ভালোবাসা দেখিয়েছেন দুজনের প্রতি। খ্রিষ্টান হয়েও নিজের অলংকার খুলে সাহায্য করেছেন অসহায় মুহাজিরদের জন্যে। নিয়মিতই কিছু দান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সুন্দর কিছু সময় কেটেছে তার কাছে।

***

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৪ অক্টোবর, ১৯৮২

লিখতে বসেছি কত বছর পর? এতবড় বিপর্যয়ের পর, দুনিয়াটাকে পানসে মনে হয়! কিন্তু আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া গুনাহ। কী হবে লিখে? কী লাভ! জীবনের মূল্যই যদি না থাকল! তবুও বাচ্চাদের জন্যে হলেও কিছু কথা লিখে রাখতে হবে। তারা ভবিষ্যতে জানবে! তাদের আব্বু-আম্মু কেমন ছিলেন। উম্মাহর জন্যে কতটা ত্যাগ করেছেন। হ্যাঁ, আমাদের আপাতত দুই সন্তান! আরেক জনের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি!

***

মানুষ যেটাকে ভালো মনে করে, সেটা তার জন্যে ভালো নাও হতে পারে। আম্মানে খালার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াও তেমন একটা ঘটনা। ওটা ছিল মারাত্মক ভুল। খালার কাছ থেকে খবর চলে গিয়েছিল বাড়িতে। দামেশকের সুনির্দিষ্ট ঠিকানা বলতে না পারলেও, মুখাইয়ামে ইয়ারমুকে থাকি, এটুকু তথ্য বাড়িতে পৌঁছেছিল। খালা হয়তো খারাপ কিছু ভেবে বলেননি। আম্মুকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই বলেছিলেন, আমি ভালো আছি। সুখে আছি। ভাইয়ার কাছে আমার অবস্থান ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এতদিনের গোপনীয়তা উদোম হয়ে গেল। এটা জেনেছি দুর্ঘটনা ঘটার পরে। আগে জানলে সতর্ক হওয়া যেত।

***

আম্মান থেকে ফিরে এসে দামেশকে আগের ডেরাতেই উঠেছি। একটা স্কুলে পড়াই। আলি আগের মতো দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকে। অবাক লাগে একটা মানুষ এতটা আত্মত্যাগ করতে পারে? কোনও লোভ ছাড়া। নিজের জন্যে কোনও উচ্চাশা করা ছাড়া! বুকটা গর্বে ভরে যায়! আল্লাহর কাছে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করি। ভাগ্যিস সেদিন ভোরে চার্চে গিয়েছিলাম। নইলে কি এমন সোনার হরিণ এসে ধরা দিত! আলি বলে উল্টো কথা! সে-ই নাকি সৌভাগ্যবান! তার ভাগ্য, সেদিন দাদুর সাথে এসেছিল! নইলে এমন একটা 'রত্ন' সে কোথায় পেত! সে এমনভাবে বলে, শুনে মনটা অপার প্রাপ্তিতে ভরে যায়! নাই-বা হলো স্থায়ী ঠাঁই! নাই-বা হলো নিরাপদ একটি নীড়! স্বামীর ভালোবাসা আর উম্মাহর জন্যে কিছু করতে পারা, এর কোনও তুলনা হয়!

***

আমাদের বড় ছেলে, ইউসুফ। প্রতিদিন মাদরাসায় যায় সবার সাথে। সেদিন আর ফিরল না। আলি তখন হালাবে গেছে। চারদিক খুঁজেও পাওয়া গেল না। মনটা ভেঙে পড়তে চাইলেও কষে শক্ত করলাম। এভাবে একটা ছেলে হারিয়ে যাবে! আলি থাকলে সে আরও বেশি করে খোঁজ-খবর করতে পারত!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রায় দশ দিন পর একটা চিঠি এল। ভাইয়া লিখেছে! ইউসুফ তার নানির কাছে আছে। আমি ফিরে না গেলে, তাকে আর পাব না। শত কষ্টের মাঝেও এটুকু প্রবোধ মিলল, যাক ছেলেটা খারাপ থাকবে না। কিন্তু আমার ফেরা সম্ভব নয়। সবাই হয়রান হয়ে গেল, তাকে কীভাবে নিয়ে গেল? ভাইয়া তা হলে, আমাদের পেছনে লেগেই ছিল এতদিন!

আলিকে লোক মারফতে জানালাম সবকিছু। আলি বলল, তা হলে এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। ঠিকানা বদলাতে হবে। নতুন কোথাও। আলিরও এখানে আসা ঠিক হবে না। উপরের নির্দেশে আমরা আবার ফিরলাম বৈরুতে। বৈরুত তখন বারুদের বাক্স। কে নেই এখানে? খ্রিষ্টান মিলিশিয়া, শী'আ, সুন্নী, ফিলিস্তিনী, লুবনানের সরকারি বাহিনী, ফ্রান্স, আমেরিকা! বাকি ছিল ইসরায়েল! তারাও শেষে এসে যোগ দিয়েছে! মরছে অসহায় ফিলিস্তিনী ভাইবোনেরা!

***

বৈরুতের দিনগুলো কাটছিল, সব সময় মৃত্যুকে হাতে নিয়ে। আলি ফিলিস্তিনীদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। আমাকেও থাকতে হয়েছে পাশে পাশে। মাঝেমধ্যে যুদ্ধফ্রন্ট ছেড়ে অন্যদিকেও কাজ করতে হয়েছে। আহতদের সেবা দিতে হয়েছে। ইহুদী সেনারা এসে হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফিলিস্তিনীদের ওপর। সাথে আছে খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীরা। স্মরণকালের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে সাবরা-শাতিলায়! হাজার হাজার অসহায় মানুষকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে, তিন দিন ধরে একনাগাড়ে হত্যা করে গেছে! এভাবে নিরপরাধ মানুষের ওপর গণহত্যা চালানো, পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল! আমরা সবাই কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম!

***

সাবরার গণহত্যার আগের দিন, মানে ১৫ই সেপ্টেম্বর, আমাদের বাসার সামনে একটা পাগলকে, ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। প্রথম দিকে চোখে পড়েনি। পাশের বাসার এক বোন পাগলটার প্রশংসা করার পর, আলাদা করে নজরে এল। দেখেই কেমন চমকে উঠলাম! পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা আর মুখটা দাড়িগোঁফে ভর্তি হলেও চেহারাটা কেমন চেনা চেনা লাগল! আমি কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম! আমাকে কাছে যেতে দেখে, পাগলটা কেমন একটা অন্যমনস্ক ভঙ্গি করে উল্টো দিকে এলোমেলোভাবে হাঁটতে শুরু করল। আমি তার পিছু নেয়া সমীচীন মনে করলাম না। পরে বুঝতে পেরেছি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওটা ছিল আমার জীবনের দ্বিতীয় বড় ভুল! প্রথম ভুলটা ছিল খালার বাসায় যাওয়া!

পাগলটার পিছু নিলে জানতে পারতাম, ওটা আর কেউ নয়, আমার ভাই! আমাদের ট্রেস করার জন্যে এসেছিল। চিনেছি কী করে? রাতে আলিকে পাগলটার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, তাকে চেনে। মানে দেখেছে! কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার মাথায় এল, এই লোকের হাঁটার ভঙ্গিটা ভাইয়ার সাথে মিলে যায়! তারপরও নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলা ঠিক নয়। কী মনে করে আলিকে আশঙ্কার কথা বললাম! আলি শোনার সাথে সাথে শোয়া থেকে উঠে গেল! চিন্তিতভাবে একটু পায়চারি করে বলল, আমাদের আর এই বাসায় থাকা একমুহূর্তও নিরাপদ নয়। ইশ এ আশঙ্কার কথাটা যদি আমি আসার সাথে সাথে বলতে! চলো চলো, দেরি করা যাবে না!

আমার হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ দিয়ে, মুহাম্মাদকে আলি কোলে নিল! আরেকটা ব্যাগে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল! বের হওয়ার আগে সব সময় যা করি, বাতি নিভিয়ে আলি জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকাল! সাথে সাথে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল! অত্যন্ত ব্যস্ত স্বরে বলল,

-যিয়াদাহ, তুমি মুহাম্মাদকে কোলে করে পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে যাও! আমি একটু পরে আসছি! বের হয়ে আমার অপেক্ষা করবে না! সোজা 'দ্বিতীয় বাড়িতে' চলে যাবে! আল্লাহ চাহেন তো ওখানে আমাদের দেখা হবে! ইনশাআল্লাহ! নইলে...

-নইলে কী?

-না কিছু না, তুমি যাও! দেরি কোরো না! তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

-আমি একা যাব না!

-একা কোথায়, মুহাম্মাদ আছে, আরেকজন মেহমান কিছুদিন পরেই আসছে ইনশাআল্লাহ!

-তুমিও আমার সাথে চলো!

-যিয়াদাহ! তুমি কি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছ না? কেউ একজনকে এখানে থাকতে হবে! ওদের এখানেই ঠেকাতে হবে! নইলে কেউই বের হতে পারবে না!

***

আহা, এমন পরিস্থিতিতে কখনো পড়ব, কল্পনাও করিনি। বড় সন্তান থেকেও নেই। এখন স্বামীকেও....! চিন্তার সময় নেই! আলি আমাদের একপ্রকার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধাক্কাতে ধাক্কাতেই পেছন দরজার কাছে নিয়ে এল! মুহাম্মাদকে কোলে তুলে চুমু খেল! যাওয়ার আগে বলে গেল,

-অনেক করে চেয়েছিলাম, তোমাকে সুখী করতে! চেষ্টার কমতি করিনি! স্বামীর হক আদায়ে ভুল হলে দয়া করে মাফ করে দিয়ো! আমাকে ভালোবেসে তুমি পার্থিব অনেক বড় বড় প্রাপ্তিকেও তুচ্ছ করেছ! তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই! তোমার মতো একজন মহীয়সী পাশে না থাকলে, আমার এ পথে টিকে থাকা দুরূহ হয়ে যেত! বাচ্চাদের সঠিক দ্বীনশিক্ষা দিয়ো! বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের জন্যে গড়ে তোলো! ওদের আব্বুর কথা তাদের বোলো! ইউসুফের সাথে যদি কখনো তোমার দেখা হয়, তাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো!

***

নয় মাসের আসন্নপ্রসবা একজন নারীর একা একা হাঁটাই কষ্টকর, তার ওপর মুহাম্মাদকেও কোলে নিতে হয়েছে! বড় কষ্ট হচ্ছিল! কিন্তু আমাকে হাঁটতেই হবে! গলিটা পার হতেই পেছন থেকে ব্রাশ ফায়ারের কর্কশ ধ্বনি ভেসে এল! সাথে সাথে গ্রেনেড বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ! না থেমে চলতে থাকলাম! থমকে গেলে চলবে না! এগিয়ে যেতে হবে আরও বহুদূর! আমাদের সন্তানদের বাঁচাতে হবে! বাবার রেখে যাওয়া পতাকা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে! কুদসকে মুক্ত করতে হবে! একজনের পথচলা ক্ষণস্থায়ী জীবনের দিকে। আরেকজনের অনন্ত জীবনের দিকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

# রেসিডেন্সিয়াল গার্লস স্কুল ইন হারার

একটু পর বিমান ছাড়বে। যাত্রা বহুদূরের। সেই পৃথিবীর প্রায় শেষ প্রান্তে, কানাডার অটোয়ায়। আদ্দিস আবাবা থেকে অতদূরে সরাসরি ফ্লাইট আছে কি না জানি না, তবে আমি যাচ্ছি ভেঙে ভেঙে। দাদুর ইচ্ছা পূরণ করতে! নিজের শিক্ষা পৃথিবীতে সরাসরি আপনজন বলতে একমাত্র দাদুই বেঁচে আছেন। দাদু যে এত কষ্ট বুকে চেপে রেখেছেন, ঘুণাক্ষরেও কখনো টের পাইনি। টের পেতে দেনওনি। কী করে এত কষ্ট বুকে চেপে এতগুলো দিন পার করে এসেছেন? একটা মানুষ এত চাপা হয় কী করে? দাদুর কষ্টের কথাগুলো লিখতে গেলে ঢাউস এক মহাকাব্য হয়ে যাবে। প্রতিটি মানুষের জীবনই আসলে হাজারো মহাকাব্যের সমষ্টি! আমাদের পরিবারে সেই দাদাভাই থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত, প্রত্যেকের জীবনই নানা বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহে ভরপুর! জীবন পরিক্রমার বাঁকগুলো শুধু কালকে নয় স্থানকেও ছুঁয়ে গেছে! দেশের সীমা ছাড়িয়ে মহাদেশীয় বলয়কে ধারণ করেছে। ঘটনার শেকড় আমাদের 'হারার' হলেও শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত হয়েছে আদ্দিস আবাবা, ইরিত্রিয়া, রোম হয়ে কানাডার অটোয়া পর্যন্ত!

***

হারার একটি ঐতিহ্যবাহী খান্দানী মুসলিম শহর। ইথিওপিয়ার সর্বপূর্বে, সোমালিয়ার সীমান্ত ঘেঁষা। ইউনেস্কো পুরো শহরটাকেই 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ শহর থেকেই একসময় পুরো ইথিওপিয়াকে শাসন করা হয়েছে। পুরো আফ্রিকায় ইসলামের পতাকা বুলন্দ করা হয়েছে। আচ্ছা থাক, শহরের ইতিহাস নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। প্রথমেই দাদা-দাদুর কথা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

না বললে, আমার আর জুমাইমার প্রসঙ্গটা অসংলগ্ন মনে হবে। অনেক চেষ্টা করেও দাদুর মুখ থেকে আমরা একটা শব্দও বের করতে পারিনি! আমাদের শরীরের রং একরকম, তার রং আরেক রকম কেন? তিনি সযত্নে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতেন! সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনার পর, আমি যখন ভীষণ মুষড়ে পড়লাম, তখন দাদু প্রায় অর্ধশতাব্দীর মৌনব্রত ভঙ্গ করলেন।

***

প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ হলো। মাধ্যমিক শেষ। কলেজ শেষ হলো। আমার ইচ্ছা ছিল রাজধানীতে গিয়ে পড়ার। আদ্দিস আবাবার ভালো ভার্সিটি ও মেডিকেল কলেজগুলোতে একমাত্র খ্রিষ্টান ছেলেরাই পড়তে পারে। মুসলিমদের ভর্তির সুযোগ এখনো অবাধ হয়ে ওঠেনি। অবশ্য সম্রাট মরিয়াম হাইলে সেলাসির পতনের পর আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। আব্বুর যা আয়রোজগার, তাতে আমার ভালো মেডিকেল কলেজে পড়ার ইচ্ছাটা ছিল আকাশকুসুম কল্পনা! তারপরও একদিন কথাপ্রসঙ্গে আম্মুকে বলে ফেলেছিলাম। তিনি শুনে আঁতকে উঠেছিলেন, বলে কি ছোঁড়া! একান-ওকান করে আব্বুর কানে পৌঁছল! তারপর দাদাভাইয়ের কানে। রাতের দিকে পরামর্শসভা বসল। টানটান উত্তেজনা নিয়ে ঘুমুতে গেলাম। ফজরের পর দাদুর ঘরে ডাক পড়ল। আব্বুও সেখানে বসে আছেন। একটু পর দাদু আর আম্মুও এলেন। দাদাভাই গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন :

-বিলাল, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমার ইচ্ছেটা আমরা যেভাবেই হোক পূরণ করব!

-দাদু, পরিবারের সবাইকে কষ্টে ফেলে, আমি উচ্চশিক্ষা চাই না! আর এটা আমার কোনও স্থায়ী ইচ্ছেও নয়। এক বন্ধু পড়তে যাবে, তার দেখাদেখি আমিও বলেছি।

-আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা নয়, আমাদেরই সিদ্ধান্ত। তুমি আদ্দিস আবাবায় পড়বে!

-ওখানে আমি একা একা কীভাবে থাকব? ঘরবাড়ি ছেড়ে আমি কখনো বাইরে থাকিনি!

-বাইরে থাকতে হবে না! ঘরোয়া পরিবেশেই থাকবে! কানাডার সরকারি দপ্তরের এক লোকের বাসায় থেকে তুমি পড়াশোনা করবে! রাতেই আমরা তার সাথে ফোনে কথা বলেছি!

দাদাভাই কখনো যা করেননি, আমার জন্যে তা-ই করলেন। তিনি কখনো কানাডার কারও সাথে সম্পর্ক রাখতে চাননি। তিনি অতীতে একসময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কানাডা ছিলেন, সেটাই জোর করে তার জীবন থেকে মুছে দিতে চেয়েছেন। শুধু আদরের নাতির জন্যে খোলস ছেড়ে বের হলেন।

ভর্তির কাজ শেষ। পরিবারের সবাই এসেছিলেন আমাকে ভর্তি করাতে। আব্বু-আম্মু, দাদা-দাদু। দুষ্ট ছোট ভাইটা। এতদিন সবাই মিলে একটা দেহের মতো ছিলাম। আমাকে দিয়ে ভাঙনের সুর বেজে উঠল। প্রথম কয়েকদিন জড়তা থাকল, কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল না। এতদিন ছিলাম সম্পূর্ণ রক্ষণশীল এক সমাজে। আশেপাশের সবাই কালো-বাদামি। এখন আছি একেবারে ভিন্নধর্মী এক পরিবারে। দাদা-দাদুর কারণে ইংরেজি ভাষায় বেশ ভালো দখল ছিল। তাই কানাডিয়ান পরিবারের সাথে থাকতে কোনও সমস্যা হয়নি। তারাও মোটে দুজন। স্বামী আর স্ত্রী। একটা সন্তান। এখানকার এক মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করে।

***

আমাদের হারার রক্ষণশীল শহর। ইসলামি মূল্যবোধগুলো পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। তদুপরি আমাদের পবিরার শহরের ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার কারণে, শরীয়তের বিধানগুলো অন্যদের তুলনায় বেশিই মেনে চলে। মেজবান পরিবার সম্পূর্ণ উল্টো। ধর্মও ভিন্ন। তাদের চালচলন একদম ইউরোপিয়ান। তবে শালীন। মার্জিত। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমাকে সন্তানের মতো গ্রহণ করলেন। দাদু বলেছিলেন, কিছুদিন পর বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দেবেন। আপাতত নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে নিক। আঙ্কেল রোনে বললেন, তার প্রয়োজন নেই। ও আমাদের কাছে ছেলের মতোই থাকবে। আব্বুর ইচ্ছা আমি বোর্ডিংয়ে থাকি। এখানে থাকলে ইবাদত-বন্দেগীতে সমস্যা হবে। আঙ্কেল এটাও নাকচ করে দিলেন। ওর যেভাবে ইচ্ছা থাকবে। কোনও সমস্যা হবে না।

***

পড়শোনা চলছে। ছুটি হলে বাড়ি যাই। আব্বু-আম্মু আমাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে কয়েকটা শহর উজিয়ে চলে আসেন। আমি মানা করি,

-কেন কষ্ট করে আসেন, আমি তো আসছিই!

কিছুদিন পর দেখলাম, আব্বু তার এক বন্ধুর গাড়ি ভাড়া করে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। পথের মধ্যে আমাকে বাস থেকে নামিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে নেয়ার জন্যে। সবাই মিলে আনন্দ করতে করতে ঘরে ফেরা। আব্বু-আম্মু আমাকে যে কী ভালোবাসতেন, বলে বোঝানো যাবে না। আমি কখন বাড়ি ফিরব, কবে আমার ছুটি হবে, তার 'পাইপয়সা' হিশেব রাখতেন। দাদা-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দাদুও আসতেন। ছোট ভাই আমরও আসতো। লক্করঝক্কর মাইক্রোবাসটাতে যেন আস্ত হারার শহরটাই এঁটে যাবে।

***

বাড়িতে এসে দেখি সবার আচরণ একেবারে বদলে গেছে। আগে ছিলাম 'তুই' এখন হয়ে গেছি 'তুমি'। আগে যা রান্না হতো, সেটাই মুখবুজে খেতে হতো! এখন প্রতিবেলায় একবার দাদু, একবার আম্মু, একবার দাদাভাই, একবার আব্বু এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন, পরের বেলায় কী খেতে ইচ্ছে করছে! খেতে বসেও কি নিস্তার আছে? সবার পাত খালি, আমার প্লেটে একটার পর একটা মাছের টুকরা, গোশতের টুকরা উঠছে! আদরের চোটে আমি কাহিল। শেষমেষ আর থাকতে না পেরে আম্মুর কাছে অভিযোগ করে বসলাম! আমাকে কেন এমন পর করে দেয়া হচ্ছে!

ছোট ভাইটাও বদলে গেছে। আগে সারাক্ষণ আমার দোষ খুঁজে বেড়াত! তার বিচারের জ্বালায় ঘরে তিষ্টানো মুশকিল হয়ে যেত! স্কুলে স্যারদের কাছে নালিশ দিয়ে প্রায়ই আমাকে পিটুনি খাওয়াত! খেলতে গেলে, বড় ভাই বলে শ্রদ্ধা করা দূরের কথা, উল্টো ল্যাং মারত! আমার প্রতিটি কথায় দশটা-বিশটা ভুল বের করত! সেও আমাকে তোয়াজ-তাজিম করে চলতে শুরু করল! যেন আমি এ ঘরে মেহমান এসেছি! আম্মু বললেন :

-শোনো ছেলের কথা! এতদিন পর দুদণ্ডের জন্যে এসেছিস, সবাই তাই যত্নআত্তি করছে! তুই মেহমান হতে যাবি কোন দুঃখে?

***

এভাবে কলেজজীবন প্রায় শেষ। চূড়ান্ত পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে! পরীক্ষার আগে সবার দোয়া নেয়ার জন্যে একবার বাড়ি যাব দুদিন পর! বাড়ি যাওয়ার দিন বেশ ভোরে আঙ্কেল এসে দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে আমি অবাক! এত ভোরে তিনি ঘুম থেকে জাগেন না। ঘুম ঘুম চোখে তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধীরপায়ে আমার খাটে এসে বসলেন। আমাকেও বসালেন। আমি অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম! তিনি কি কিছু বলতে এসেছেন? আমাকে আর থাকতে দিতে পারবেন না?

-বিলাল! একটু সমস্যা হয়েছে! তোমাকে কীভাবে যে বলি! একটু আগে হারার থেকে ফোন এসেছিল!

কেন যেন আমার সর্বশরীর ভীষণভাবে কেঁপে উঠল! ছোটখাটো কোনও বিষয় হলে, ফোন আসার কথা নয়! কেউ মারা গেছে? দাদাভাই? নাকি দাদু? কিন্তু দুজনেই শক্তপোক্ত! নীরোগ। অবশ্য জীবনমৃত্যু আল্লাহর হাতে। তিনি যখন যাকে ইচ্ছা তুলে নেবেন। কোনও অসুখ-বিসুখ ছাড়াই!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

-আঙ্কেল, ওদিকে কোনও সমস্যা হলে নির্দ্বিধায় বলুন!
-আসলে ঠিক সমস্যা নয়, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে! তোমাকে নেয়ার জন্যে তোমার পরিবারের সদস্যরা মাইক্রোবাসে করে এগিয়ে আসছিল! পথিমধ্যে একটা যাত্রীবাহী বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসটা পাহাড়ের গভীর খাদে পড়ে গেছে!

আমার পায়ের তলার পৃথিবী বনবন করে ঘুরতে লাগল! মাথার ভেতরটা সম্পূর্ণ শূন্য আর ফাঁকা লাগল! কোনও সাড়াশব্দ নেই! নিঝুম একটা ভাব! আঙ্কেল আরও কী কী বলে গেলেন, আমি শুনতে পেলাম না! মাথাটা ঘুরে উঠল! পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতেই তিনি আমাকে ধরে ফেললেন। হুঁশ ফিরতেই প্রথম প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বের হয়ে এল :

-মাইক্রোতে কে কে ছিল?
-তোমার দাদু ছাড়া সবাই ছিল! তোমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে! দাদুর পাশে দাঁড়াতে হবে!

***

শুরু হলো নতুন জীবন। আব্বু-আম্মুহীন, দাদা আর ছোট ভাইহীন এক খাঁ খাঁ জীবন। দাদুকে সান্ত্বনা দেবো কি, উল্টো তিনি আমাকে আগলে রাখতে উঠেপড়ে লাগলেন। ঠিক করলাম পরীক্ষা দেবো না। কী হবে পড়াশোনা করে! যা পড়েছি, তাতে এখানকার কোনও স্কুলে বা মাদরাসায় শিক্ষকতার চাকরি পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। দাদু বেঁকে বসলেন। তিনি পারলে একপ্রকার আমাকে ধাক্কা দিয়েই আদ্দিস আবাবায় পাঠান আর কি! রাতদিন বোঝাতে লাগলেন! আমার সিদ্ধান্তকে ভুল বলতে লাগলেন! কিছুতেই আমাকে মানাতে না পেরে, শেষে বললেন :

-বিলাল তুই কি আমার চেয়েও বেশি হারিয়েছিস? তুই মাকে পেয়েছিস, বাবাকে পেয়েছিস, দাদা-দাদু পেয়েছিস! নানা-নানু সবাইকে পেয়েছিস! আমি জীবনে কাউকে পাইনি! সেই বুঝ হওয়ার বয়েস থেকেই! আমি সবার থেকে, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন! শেকড়হীন উন্মূল!
-তোমার বাবা-মাকেও পাওনি?
-ছয় বছর বয়েস পর্যন্ত পেয়েছিলাম। তারপর থেকে আর পাইনি! আমাদের বাড়ি ছিল কানাডার গ্র্যান্ড রিভার অঞ্চলে। আমাদের 'ট্রাইব' ওখানেই হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসছিল! ষোড়শ শতকের দিকে ইংরেজরা দলে দলে আমেরিকা মহাদেশে ভিড় জমাতে শুরু করল। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মহাদেশের আরও গভীরে। দখল করে নিতে শুরু করল একের পর এক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জনপদ! আদিবাসি রেড ইন্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করে! নির্মূল করে! তাদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে!

***

এভাবে চলল দীর্ঘদিন! তারপরও রেড ইন্ডিয়ানরা দমে যায়নি। প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল। এতকিছুর পরও আমাদের বিনাশ করতে না পেরে, তারা নতুন কৌশল গ্রহণ করল! আঠারো শতকের গোড়া থেকে তারা আমাদের নির্বংশ করতে শিশুহত্যা চালাতে শুরু করল। এটাও ফলপ্রসূ হলো না। এবার তারা অত্যন্ত সুচিন্তিত সুদূরপ্রসারী বিধ্বংসী কৌশল গ্রহণ করল। আমাদের শিশুদের ছলেবলেকৌশলে, জোরজবরদস্তি করে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিতে শুরু করল।

-কেন? শিশুদের নিয়ে তারা কী করবে?

-তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির কিছু স্কুল খুলল! রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নাম দিয়ে। স্কুলগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন মতাদর্শের চার্চের হাতে। ফাদার আর নানরা সবকিছুর দেখভাল করত! দু-বছর হলেই আমাদের বাবা-মায়েরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, কখন শিশুলুটেরার দল আসবে! অনেক পরিবার সন্তান বাঁচাতে বনের আরও গভীরে চলে যেত! কিন্তু তাদের শাদা ডাকুদের কাছে তালিকা থাকত! কার সন্তান কখন হবে তার! কেউ তাদের হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত থাকতে পারত না! একজন পালিয়ে গেলে, পুরো এলাকার ওপর আকাশভাঙা নির্যাতন নেমে আসত!

***

রেসিডেন্সিয়াল স্কুলগুলো ছিল জেলখানার চেয়েও বেশি কিছু। আমরা হাসতে পারতাম না। নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারতাম না। ক্লাসের বাইরের কোনও বই-পত্রিকা পড়তে পারতাম না। আমরা একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারতাম না। ফাদার-নানরা বলত, ভালোবাসা শয়তানের কাজ। ভাইরাস জাতীয় কোনও রোগে আমাদের কেউ আক্রান্ত হলে, তার সাথে শাস্তি হিশেবে নিয়মভঙ্গ করা সুস্থদেরও শুইয়ে রাখা হতো। এমনও হয়েছে, এই শাস্তির কারণে, পাঁচ-ছয়জন শিশু একসাথে মারা গেছে। কোনও চিকিৎসা ছাড়াই! ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রচণ্ড নির্যাতন করা হতো। অনেকে মারা যেত। তাদের গোপনে কোথাও মাটিচাপা দেয়া হতো। কেউ কোনওদিন জানতেও পারবে না, তারা কোথায়। কেমন আছে।

একেকটা ডরমিটরিতে একটা করে টয়লেট ছিল। খাবার পানির কোনও ব্যবস্থা ছিল না। টয়লেট সব সময় ব্যস্ত থাকত। রাতদুপুরে কারও পিপাসা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

লাগলে পানি খেতে হতো টয়লেট সাপ্লাই থেকে। বাইরে বের হওয়ার উপায় ছিল না, বরফপাত আর তুষার ঝড়ের কারণে। আর গেইটও বন্ধ থাকত।

***

রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর মনে এ কথা বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতো, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, ইন্ডিয়ান হয়ে জন্মানো একটি 'সিভিয়ার ক্রাইম'। সবাইকে ইংরেজদের মতো হতে হবে। তা হলে অপরাধ কাটা যাবে। ফাদার-নান থেকে শুরু করে সমস্ত স্টাফই পাশবিক মগজ ধোলাইকর্ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করত!

আমাদের সবকিছু করতে হতো শাদা মানুষদের মতো। পোশাক, খাবার-দাবার ওঠাবসা খেলাধুলা। কথাবার্তা। তারা আমাদের জীবন থেকে গড়ে ১১ বছর কেটে রেখে দিত। জীবনটাকে নষ্ট নীরস করে দিত। বাবা-মা সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিত। অসুস্থ হলে আমাদের দেখার কেউ ছিল না। সকালে সন্ধ্যায় কোনও আপনজনের ছোঁয়া ছিল না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনিয়মেও শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠিন বর্বর অমানুষিক।

***

সারা কানাডাজুড়ে যত রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আছে, সবগুলোর আকাশে-বাতাসে কান পাতলে শোনা যাবে হাজারো শিশুর আর্তনাদ। প্রতিরাতেই আমরা কামনা করতাম, আগামীকাল সকালে যেন আর জেগে না উঠি! ইশ, আমাদের যদি উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকত! আমার যদি মাটির নিচে চলে যাওয়ার শক্তি থাকত! আমাদের নির্যাতন করার জন্যে মাটির নিচে বয়লার রুমে নিয়ে যাওয়া হতো। মেশিনের বিকট আওয়াজে শিশুদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ মিলিয়ে যেত। পরিসংখ্যান মতে শতকরা ২৪ জন শিশু রেসি স্কুলের নির্যাতন সইতে না পেরে মারা পড়ত।

সবাই প্রতীক্ষার প্রহর গুণত। কবে মুক্তির দিনটি আসবে। কবে বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি মিলবে। বাড়ি গিয়েও মুক্তি মিলত না। পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থেকে, ভাষা-চালচলন সব আলাদা হয়ে গিয়েছে। কেউ কাউকে বুঝতে পারত না। এক শেকড়হীন অনুভূতি। প্রায় সাতটা প্রজন্মজুড়ে দেড় লাখেরও বেশি শিশুকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাদের গড়ে তোলা হয়েছে শেকড়হীন করে।

অনেক শিশুর পিঠ থেকে শুরু করে উরু পর্যন্ত ছিল ক্ষতবিক্ষত। চামড়ার মোটা বেল্ট দিয়ে পেটানো হতো। আমাদের অনেকেরই শ্রবণশক্তি দুর্বল। কারণ, আমাদের কানে সজোরে থাপ্পড় মারা হতো। অনেক সময় উপর্যুপরি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাবার আঘাতে কান থেকে রক্ত ঝরত। কান পচে রক্ত বের হত। চিকিৎসা নেয়ার উপায় ছিল না। ছয়-সাত বছরের শিশুকে কান ধরে ছুড়ে ফেলা হতো। মাথার ওপর থেকে আছাড় মারা হতো। অনেকের কোমরের হাড় আজও ভাঙা। আমার এক বান্ধবীকে, এক নান দোতলার জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলেছিল। ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে।

***

ইউরোপিয়ানরা ইন্ডিয়ানদের গ্রামে চিকেন পক্সের জীবাণু ছড়িয়ে দিত। মারা পড়ত শত শত মানুষ। তাদের মুখ বন্ধ করতে এ ব্যবস্থা নেয়া হতো। তাদের সন্তানদের জড় কেটে দিতেই তারা এটা করত। ইন্ডিয়ান বসতিগুলো পরিকল্পিতভাবে প্লেগ ছড়িয়ে দেয়া হতো। ছাত্রদের ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে শাস্তি দেয়া হতো।

মিশনারি ডাক্তার ও ফাদাররা হাজারো নারী-পুরুষকে চিকিৎসার নামে বন্ধ্যা করে দিত। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরও এমন নিগ্রহ হতো। সরকারের পক্ষ থেকে ডাক্তারকে প্রতিটি নারী বা পুরুষকে 'স্টেরিলাইজড' করার জন্যে ৩০০ ডলার করে দেয়া হতো।

রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে থাকাকালেই বহু মেয়ে গর্ভবতী হয়ে যেত। ফাদারদের নির্মম অত্যাচারে! অনেক সময় গর্ভবতী মেয়েকে তার সন্তানসহ মেরে ফেলা হতো। অনেক সময় শুধুই সন্তানকে মারা হতো। প্রতিসপ্তাহেই কেউ না-কেউ আত্মহত্যা করত। অনেক সময় নানরা ছেলেদের দিয়ে নোংরা কাজ করাতো। নিজেদের অবদমিত লিপ্সা চরিতার্থ করতে। ফাদাররাও ছোট ছোট ছেলেদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাত।

অনেক সময় শিশুদের পরিকল্পিতভাবে ড্রাগ এডিক্ট করে তোলা হতো। তারপর স্কুল থেকে বের করে দেয়া হতো। তারা কিছুদিন পর অসহায়ভাবে খোলা রাস্তায় পড়ে মারা যেত। অনেকের শরীরে এইচআইভিও পাওয়া যেত।

***

আমাদের জোর করে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হতো। আমাদের মধ্যে যাদের বুঝ হতো, তারা প্রথম প্রথম ক্রিশ্চিয়ানিটির রিচুয়াল পালন করতে অস্বীকৃতি জানাত। তাদের অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রহার করা হতো। চার্চে যেতে বাধ্য করা হতো। আমরা যতদিন রেসি স্কুলে ছিলাম, বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোনও ধারণাই পেতাম না। সেটা ছিল এক নির্মম বন্দীজীবন। একটানা ছয়-সাত বা আট বা এগারো বছর এখানে কাটাতে হতো। কারও বেশি কারও কম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কারও বাবা-মা সন্তানকে নিয়ে আসতে গেলে তাদের পুলিশে দেয়া হতো। কোনও কোনও স্কুলে ক্রিসমাসের দিন বাবা-মায়ের সাথে দেখা করারও সুযোগ দেয়া হতো। আমরা পরস্পর ইন্ডিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারতাম। এই একদিনের জন্যে তারা কেন উদারতা দেখাত, কী জানি। বাবা-মা সন্তানের সাথে চাইলে দেখা করতে পারত কোনও কোনও স্কুলে। তাও বছরে এক বা দুই বার। তবে গুণতে হতো চড়া মাশুল।

***

১৮৩০ সালের দিক থেকে এ স্কুল সিস্টেম চালু হয়। ১৯৯৬ সালে এসে এ ভয়ালযজ্ঞ পুরোপুরি শেষ হয়। অবশ্য আমাদের মোহাক ইনস্টিটিউট চালু হয়েছিল ১৮২৮ সালে। আমি আমার বাবা-মাকে দেখিনি। তাদের সংবাদও বের করতে পারিনি। প্রায় দেড় শ বছর ধরে এই আদিম পাশবিক জংলি স্কুলব্যবস্থা ছিল। দেড় লক্ষেরও বেশি ছেলেমেয়েকে মায়ের কোল থেকে উপড়ে নিয়ে আসা হয়েছিল! পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি শিশুর কোনও হদিস নেই। শেষের দিকে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ক্ষতি যা হওয়ার তা উনিশ শতকেই হয়ে গিয়েছিল!

***

দাদু কথা বলছিলেন আর অঝোরে কাঁদছিলেন। আমার চোখেও বান ডেকেছিল। কী করে মানুষ এতটা অসভ্য হতে পারে? আমি শুধু আমার পরিবারকে হারিয়েছি, দাদু যে পুরো শৈশব-কৈশোর-বয়ঃসন্ধি ও নিজের জাতিকে হারিয়েছেন! কী দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে চেপে দাদু এতদিন চুপ করে ছিলেন?

-দাদু, এ জন্যই তুমি বাম কানে কোনও না?

-হ্যাঁ রে ভাই! আরও অনেক সমস্যা!

-তুমি সেই কানাডা থেকে এই সুদূর আফ্রিকার হারারে কীভাবে এলে?

-সে অনেক লম্বা কাহিনি! ডোরবেল বাজছে! কে এল দেখত?

***

আমি ভেবেছিলাম আব্বুর কোনও বন্ধু বা পাড়া-পড়শি কেউ এসেছে! প্রতিদিনই কেউ না-কেউ এসে সমবেদনা প্রকাশ করে যাচ্ছে! গতকাল আব্বুর এক কলিগ এসে আমার হাতে একটা খাম তুলে দিলেন। বললেন, তোমার আব্বু আমার কাছে পেতেন! আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, তিনি মিথ্যা বলছেন! আব্বুর প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা থেকে তারা এটা করছেন। এমন খাম একজন নয়, গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকজন আমার হাতে গুঁজে দিতে চেয়েছেন। আমি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দরজা খুলে আমি ভীষণ অবাক! আদ্দিস আবাবা থেকে আঙ্কেল রোনে এসেছেন। সাথে এসেছে তার মেয়ে জুমাইমা। ভেবে কূলকিনারা করতে পারছিলাম না, ও কি কানাডা থেকে শুধু আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে উড়ে এসেছে? নাকি অন্য কিছু? মাথায় কালো স্কার্ফ! দস্যি মেয়ের মাথায় কালো স্কার্ফটা কেমন যেন লাগে!

অপ্রত্যাশিত মেহমান দেখে দাদু শশব্যস্ত হয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। জুমাইমাকে তিনি আগে দেখা তো দূরের কথা, তার নামও শোনেননি। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। দাদু পরম আদরে তাকে কাছে টেনে বসালেন। আমি আঙ্কেল রোনেকে বৈঠকখানায় বসালাম। আঙ্কেল জানালেন, বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। চলে যাবেন। দাদুর পীড়াপীড়িতে একবেলা খেয়ে যেতে রাজি হলেন।

***

চটজলদি জোগাড়যন্ত্রে নেমে পড়লাম। আঙ্কেলের সাথে সবার জন্যে আরও কয়েকজনকেও নিমন্ত্রণ করলেন দাদু। আমি বাইরের কাজে দৌড়াদৌড়ি করছিলাম। দাদু ঘরের কাজ একা একা সামাল দিচ্ছেন দেখে, জুমাইমাও সাথে জুড়ে গেল। সে এসব কাজ আগে করেছে কি না, জানি না। তবে বেশ ভালোভাবেই দাদুর সাথে মিশে গেল। দেখে মনে হচ্ছিল, সে কতদিনের আপন! বাইরের কেউ নয়!

রাতের গাড়িতে আঙ্কেল চলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। জুমাইমা আবদার জুড়ল, সে দাদুর কাছে আরও কয়েকটা দিন থেকে যাবে! দাদু ভীষণ খুশি! অল্প কয়েকটা ঘণ্টা একসাথে থেকে, নিজের দেশি মেয়েটাকে বড্ড ভালো লেগে গেছে। দীর্ঘদিন পর, এই প্রথম তিনি বাপের বাড়ির দেশের কারও দেখা পেলেন। মন খুলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারলেন। জুমাইমা প্রথমে দাদুকে দেখে আকাশ থেকে পড়েছিল! সে ভেবেছিল আমার দাদুও একজন কালো মানুষই হবেন।

জুমাইমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল আদ্দিস আবাবায় যাওয়ার পর। তখন সে মাধ্যমিকে পড়ে। তাকে পড়ানোর দায়িত্বও পালন করতে হয়েছিল। তারপর সে কানাডা চলে গিয়েছিল। আদ্দিস আবাবায় জুমাইমা পড়ত বিদেশি দূতাবাসগুলোর জন্যে নির্দিষ্ট এক দামি স্কুলে। আঙ্কেল রোনের বাড়িতে থাকতে শুরু করার কিছুদিন পর আন্টি একদিন আমাকে বললেন, তার মেয়েকে পড়ার কাজে একটু সহযোগিতা করতে। ভয়ে ভয়ে রাজি হলাম। আমি তাকে পড়াব কি, সে-ই উল্টো আমাকে পড়াতে শুরু করল। আমি পড়েছি প্রাচীন শিক্ষারীতিতে আর সে পড়ছে বিশ্বের সর্বাধুনিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শিক্ষাব্যবস্থায়। বয়েসে আমার চেয়ে সে অনেক ছোট, তবুও বিভিন্ন বিষয়ে তার অবাধ জানাশোনা আমাকে রীতিমতো নির্বাক করে দিত। আমার মাঝেমধ্যে মনে হতো, জুমাইমাকে পড়ানোর দায়িত্ব দেয়ার পেছনে আঙ্কেল-আন্টির অন্য একটা উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। আমি তাদের বাড়িতে থাকতাম, এর বিনিময়ে তারা কিছুই গ্রহণ করতেন না। কিন্তু এটা নিয়ে আমার মনে গ্লানিবোধ জন্মাতে পারে, সেটা দূর করার জন্যেই এ ব্যবস্থা। পাশাপাশি এটাও বিচিত্র নয়, মেয়েকে পড়াতে গেলে হয়তো আমারও মৌলিক যোগ্যতায় কিছুটা উন্নতি হবে, তাই এ সুযোগ। জুমাইমা ছিল অত্যন্ত ডানপিটে। আন্টি প্রায়ই বলতেন, তোমাকে দেখে যদি ও একটু শান্তশিষ্ট হতে শেখে, সেটা হবে ও জীবনের অনেক বড় পাওনা। মেয়েটা কথা শুনতে চায় না। চার্চে যেতে চায় না। তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো একটু! আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করতাম,

-আমি কীভাবে ওকে চার্চে যেতে উদ্বুদ্ধ করব? আমি নিজেই তো চার্চে যাই না?

-না গেলেও, ও তোমার ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী! তুমি কিছু মনে কোরো না, সে ইথিওপিয়ায় থাকলেও, তাদের স্কুলের সবাই ইউরোপিয়ান। তোমার আগে, আফ্রিকান কাউকে সে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়নি। সে চঞ্চলমতি হলেও তার মধ্যে একটা ভাবুক মন আছে! বয়েস কম হলেও সে অনেক কিছু ভাবতে শিখেছে!

-ঠিক আছে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব!

আমার চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছিল জানি না, তবে আমি টের পেতাম, বাবা-মায়ের চেয়েও আমার সাথে কথা বলতে সে বেশি আগ্রহী ছিল। স্কুলের অনেক কথা সে মাকে বলার আগে আমাকে বলত। আমিও তার কথা শুনে বেশ মজা পেতাম। ইউরোপিয়ানদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারতাম। বর্তমানের ছেলেমেয়েদের ভাবনাচিন্তা কেমন, সেটার গতিপ্রকৃতি আঁচ করতে পারতাম! বছরখানেক পরেই সে কানাডা চলে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আজ দেখা। প্রায় চার বছর পর। সেদিনের ছোট্ট খুকি কতবড় হয়ে গিয়েছে।

***

আঙ্কেল চলে যাওয়ার পর, গল্পের আসর বসল। জুমাইমার কৌতূহল আর বাধ মানছে না। তার দেশের একটা মানুষ আফ্রিকার এই সুদূরে কীভাবে এলেন? নিশ্চয় বড় কোনও ইতিহাস এর পেছনে লুকিয়ে আছে। দাদু তাঁর হাতের কাজ গুছিয়ে এসে বসলেন। জুমাইমাকে কী একটা মিষ্টি খেতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিলেন। মিষ্টান্ন দ্রব্যটা শুধু হারারেই পাওয়া যায় না। এখানকার কফি বিশ্ববিখ্যাত। কফিবিন মিশিয়ে কীভাবে যেন বানানো হয়। অনেক মহিলা এটা বানিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে! দাদু আসার পর, সুলিয়া মানে মিষ্টান্ন দ্রব্যটির আকারে ও প্রকারে, গুণে ও মানে অনেক পরিবর্তন এসেছে! তিনি মেধা খাটিয়ে সুলিয়াকে নতুন রূপ দান করেছেন। আগে শুধু বড়রাই খেতে পারত! এখন বড়রা তো বটেই ছোটরাও সুলিয়ার জন্যে পাগল! জুমাইমা সুলিয়া মুখে দিয়ে স্বাদের আস্বাদনে চোখ বুজে ফেলল! সেটা দেখে দাদুর চোখে পরম আদরমাখা দৃষ্টি ফুটে উঠল! তিনি বলে উঠলেন :

-তোমাকে আজ একটা সুলিয়া দিয়েছি! প্রথমবারে একটার বেশি খাওয়া ঠিক নয়। আগামীকাল আরও দেবো! এটা খেলে একটু ঘুম ঘুম ভাব আসে! অবশ্য একটু পর কেটে যায়!

-এবার আপনার ঝাঁপি খুলুন দাদু! আমার আর তর সইছে না!

-কীভাবে যে খুলি, খুললেই সে মানুষটার কথা মনে পড়বে! এতদিনের ভালোবাসা ভুলি কী করে? তিনি আমার শরীরের একটা অংশে পরিণত হয়েছিলেন! আমার মন বা আত্মা বলেও আলাদা কিছু আছে, তার থাকাবস্থায় সেটা অনুভব করতে পারিনি! তিনি আর আমি এক দেহ এক আত্মার মতো ছিলাম! আমার কথা মানেই তার কথা! বিলালের দাদুর কথা! তিনি জীবনে এত এত সংগ্রাম করেছেন, আমি তুমি কল্পনাও করতে পারব না! এখন যে ঘরে বসে আমরা কথা বলছি, এ ঘরেই আমার শাশুড়ি থাকতেন! তিনি তার সন্তানদের নিয়ে ঘুমুতেন! তার পূর্বপুরুষ ছিল হারারের রাজা। তারা আরব থেকে এখানে এসে শত বছর হারারকে শাসন করেছেন। আফ্রিকা মহাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এখন ইথিওপিয়ার যে রাজধানী, সেটাও তাদের রাজত্বের অধীনে ছিল! কিন্তু ইউরোপিয়ানদের আগ্রাসনে সে রাজপাট একসময় বিলুপ্ত হয়ে গেছে! ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল রাজবংশের লোকেরা।

বিলালের দাদু তখন সদ্য কৈশোর পেরুনো টগবগে তরুণ। ইতালির সরকার ইথিওপিয়া আক্রমণ করে। এটা ১৯৩৫ সালের ঘটনা। আদ্দিস আবাবায় তখন খ্রিষ্টান সরকার। তারা সারা দেশের মানুষকে ইতালিয়ান হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। বেনিতো মুসোলিনির সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা আফ্রিকার গহীন পর্যন্ত এসে পৌঁছল। হারার থেকে একদল মুসলিমও ইতালিবিরোধী সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল বিলালের দাদা। মুসোলিনি এখানে তার সর্বশক্তি ব্যয় করেছিল। আদ্দিস আবাবার যুদ্ধে মুসলমানরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। হারারী মুসলিম স্কোয়াডের দুর্ধর্ষ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বীরত্ব যুদ্ধের মানচিত্র বদলে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ইথিওপিয়ান বাহিনী পরাজিত হলো। ইথিওপিয়া চলে গেল ইতালির অধীনে। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত। সম্রাটকে আশ্রয় দিলো ব্রিটেন। শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১ সালে ব্রিটেন পরাজিত করে ইতালিকে। দখল করে নেয় ইথিওপিয়া। তারপর আসে আমেরিকা। ব্রিটেনের অধিকার খর্ব করে আমেরিকা এখানে নিজেদের অর্থনৈতিক বলয় তৈরি করে। আমেরিকার সহযোগিতায় ইথিওপিয়ায় গড়ে ওঠে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় এয়ারলাইন্স। ইথিওপিয়া থেকে প্রথম বিমান ওড়ে ১৯৪৬ সালে। ইথিওপিয়ায় নানা সমস্যা হয়েছে, কিন্তু ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের ওপর এর কোনও প্রভাব পড়েনি।

***

-তারপর কী হলো, বিলালের দাদাভাই কোথায় গেলেন?

-দুর্ভাগ্যবশত বিলালের দাদু সে যুদ্ধে ইতালিয়ানদের হাতে বন্দী হলো। আরও অনেক সৈন্যকেই বন্দী করা হয়েছিল। খ্রিষ্টানদের ছেড়ে দেয়া হলো। মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে যাওয়া হলো ইতালিতে। আমেরিকায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৮৬৫ সালে। আমেরিকার আগে বা পরে ইউরোপের অন্য দেশেও দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অধীনস্থ দেশের জনগণের প্রতি ইউরোপিয়ানদের প্রভুসুলভ মনোভাব এর এক শ বছর পরেও বদলায়নি। খোদ আমেরিকাতেই সত্তর-আশির দশকেও কালোদের প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। বিলালের দাদার নাম ছিল আজুবা বকর। রোমে তাকে একটা সেনানিবাসে রাখা হয়েছিল। মানুষটাকে দাসের মতো খাটানো হতো। দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। সৈনিকদের হেন কাজ নেই, তাকে করতে হয়নি। কিছুদিন এভাবে পশুর খাটুনি খেটে শরীর ভেঙে পড়ল। সেনা কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করালো। সেটা ছিল ভ্যাটিকান পরিচালিত একটি দাতব্য হাসপাতাল।

ডাক্তার-নার্স প্রায় সবাই ভ্যাটিকান চার্চের নিয়োগকৃত। হাসপাতালের ইটটা পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক। এখানে অন্য কোনও রোগী ছিল না। সবই বিভিন্ন দেশ থেকে বন্দী করে আনা কালো মানুষ। একটা কথা চালু ছিল, এখানে কেউ একবার ভর্তি হলে, খ্রিষ্টান না হলে বের হতে পারে না। আগ্রহে না হলেও ভয়েও অনেকে খ্রিষ্টান হয়ে যেত। একটু সুস্থ হলে বলা হতো, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তোমাকে চার্চের অধীনে কোনও দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সুখেশান্তিতে চার্চের সেবায় জীবন কাটাতে পারবে; নইলে আবার সেনা ব্যারাকে পাঠানো হবে। কোন দিকে যাবে বলো! এমন প্রস্তাবে, অত্যাচারে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জর্জরিত কালো মানুষগুলো ধর্মান্তরিত হওয়াকেই শ্রেয় মনে করত। কিন্তু বিলালের দাদা প্রস্তাবটা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল।

শুরু হলো দ্বিতীয়বারের মতো দাসের জীবন। অত্যাচার পরিশ্রম আগের তুলনায় আরও বেড়ে গেল। আগে রাতের বেলা বিশ্রামের সুযোগ দেয়া হতো। এখন তাও দেয়া হয় না। এটা ছিল পরিকল্পিত! যাতে কেউ দ্বিতীয়বার ব্যারাকে না এসে ভ্যাটিকানের কথা মেনে নেয়। অল্প কদিন পরই মানুষটা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। চার্চ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ঘটনার সাথে পরিচিত। তারা কৌশলে অগ্রসর হলো। বেলালের দাদুর মতো যারা পোষ মানতে চাইত না, তাদের জন্য ছিল অন্য ব্যবস্থা। এ ধরনের লোকদের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ওয়ার্ডে রাখত। বাইরে থাকত কড়া সামরিক পাহারা। কেউ এখান থেকে পালিয়ে যাবে, সে সুযোগ নেই। মানুষটাকে এবার বিশেষ নজরদারিতে রাখল। এখানে ডাক্তার-নার্স-সেবিকা সবাই মেয়ে। ওয়ার্ডে সব সময় কিশোরী ও তরুণী সেবিকারা থাকত। সবাই সুন্দরী। এদেরকে আনা হতো ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। কারও বাবা যুদ্ধে নিহত! কারও বাবা-মা দুজনেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত! কারও ঘর-বাড়ি নেই। কেউ পরিবারের চাপে নান হতে এসেছে। কেউ স্বেচ্ছায় কুমারী মেরির মতো হতে এসেছে। কেউ কেউ ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের ধাক্কার চাপ সইতে না পেরে জীবন থেকে পালাতে চার্চে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কাউকে গোয়েন্দা সংস্থা নিয়োগ করেছে। শুনতে অবিশ্বাস্য ঠেকলেও, সে-ই মেয়েদের অনেককে বিভিন্ন শহরের খারাপ জায়গা থেকেও সংগ্রহ করে আনা হতো। বেওয়ারিশ মেয়েরাই বেশি কাজে আসত। কারণ, তাদের কোনও পিছুটান থাকে না। মাঝেমধ্যে সমস্যা যে বাঁধত না, তা নয়। অনেক সময় দেখা যেত, মা খারাপ পাড়ায় থাকলেও, মেয়ের প্রতি দাবি ছাড়ত না। আবার কখনো কখনো মা ও বাবা দুজনেই বিয়ে করতে সম্মত হয়ে যেত! তখন সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে আসত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চার্চ রাজি হতো না। বাবা-মা জোরাজুরি করলে চার্চ নিজের অপরিমেয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাদের হাঁকিয়ে দিত! অনেক মেয়ে ছিল, তাদের ছেলেধরাদের হাত থেকে কিনে নেয়া হয়েছে। এদের বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। একদম ছোটবেলায়। আরও অসংখ্য ধাঁচের মেয়ে থাকত চার্চে। তাদের সব ধরনের শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানে-গুণে নিপুণা করে তোলা হতো। তাদের সব দক্ষতা ব্যয় হতো যিশুর কল্যাণে। খ্রিষ্টবাদের প্রচারে। বিধর্মীদের খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত করার কাজে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুসোলিনির মতো ফ্যাসিস্টের শাসনেও ভ্যাটিকানের ধর্মসাম্রাজ্য নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে কোনও সমস্যা হয়নি। এই মেয়েরা ছিল অত্যন্ত প্রশিক্ষিত। হাসপাতালটা ছিল তাদের স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি। চার্চ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখত। রোগীদের সাথে কে কেমন আচরণ করছে, কেমন অভিনয় করছে, দূর থেকে লক্ষ রাখত। কেউ যদি অভিনয়ের অতিরিক্ত কিছু করার দিকে অগ্রসর হতো, শাস্তিস্বরূপ তাকে কিছুদিন হাসপাতালের ডিউটিতে আসতে দেয়া হতো না। রান্নাঘর ও বাথরুম পরিষ্কারের কাজে লাগানো হতো। প্রচণ্ড রোদে বাগানের আগাছা সাফাইয়ে লাগিয়ে দেয়া হতো! বড় যাজকদের গৃহকর্মে লাগিয়ে দেয়া হতো। তাদের সব ধরনের সেবায় নিজেকে বিলীন করে দিতে হতো।

বিলালের দাদা যে ওয়ার্ডের রোগী ছিলেন, সেটা ছিল সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত 'দাস'দের জন্যে নির্দিষ্ট। ওয়ার্ডের গুরুত্বানুযায়ী 'মেইড' নির্ধারণ করা হতো। গুরুত্বপূর্ণ বা মেধাবী কোনও 'বন্দী' হলে, তার জন্যে নিয়োগ করা হতো চৌকস ও অত্যন্ত সুন্দরীদের। সুন্দরীরা নানা ছলাকলায় ভোলানোর চেষ্টা করত রোগীদের। রোগীরাও ব্যাপারটা যে-বুঝত না তা নয়, কিন্তু না বোঝার ভান করা ছাড়া ভিন্ন উপায় ছিল না। মুখবুজে পরিণতির অপেক্ষা করতে হতো। দুর্বল শরীরে, অবসন্ন মনে কাঁহাতক এতসব আকর্ষণীয় প্রলোভন এড়ানো যায়? সবার মধ্যে দ্বীনিশিক্ষা অতটা প্রবল ছিল না। বেশির ভাগ বন্দীই ছিল পিছিয়ে পড়া আফ্রিকা থেকে আসা। ইতালির উপনিবেশগুলো থেকে তাদের নানা কৌশলে নিয়ে আসা হয়েছে। বিলালের দাদা আর তার সাথের কিছু মানুষ ছিলেন ব্যতিক্রম। তাদের ষড়যন্ত্র করে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছে।

সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা একটি মেয়ে, নাম ছিল জুলি। সে বিলালের দাদুর ওয়ার্ডে কাজ করার দায়িত্ব পেয়েছিল। একটা ওয়ার্ডে পালাক্রমের অনেক মেয়েই দায়িত্ব পালন করত। প্রতিবারে দশজন করে। জুলির পালা বেশির ভাগ সময় পড়ত রাতের দ্বিতীয়ার্ধে। সকাল পর্যন্ত জুলিদের দল রোগীর দেখভাল করত। জুলিরা রাত একটায় কাজ শুরু করত। কাউকে ওষুধ খাওয়ানোর পালা থাকলে খাওয়ানো হতো। এরপর রোগীদের সাথে সাথে সেবিকারাও এখানে-ওখানে বসে বসে ঢুলত। কেউ কেউ অতি উৎসাহী রোগীদের সাথে গল্প জুড়ে দিত। গল্প করতে চাইলে সেবিকারা ভীষণ খুশি হতো। কথা বলতে পারলেই তাদের লাভ। যে যত বেশি কথা বলতে পারবে, সে তত নম্বর পাবে। রোগীকে খ্রিষ্টবাদের দাওয়াত দিতে পারবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জুলি সব সময় বিলালের দাদুর আশেপাশে থাকার চেষ্টা করত। তিনি ছিলেন অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তরুণ বয়েসেই তার গাম্ভীর্য আর রাশভারী ধীরস্থির আচরণ অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তিনি মনেপ্রাণে ধার্মিক ছিলেন। ইসলামের জন্যে কিছু করার জন্যে সব সময় মুখিয়ে থাকতেন। ছেলেবেলা থেকেই ধার্মিক পরিবারে বেড়ে উঠেছেন! তাই ইতালিয়ানদের আগ্রাসনের মুখে বসে থাকতে পারেননি। খ্রিষ্টশক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। যদি খ্রিষ্টান রাজা হাইলে সেলাসের পক্ষ হয়েই লড়েছিলেন, কিন্তু সে লড়াই ইসলামী হাররকে রক্ষার লড়াইও ছিল। কারণ, আদ্দিস আবাবা ইতালির দখলে গেলে হারারও যাবে। এদিকে লক্ষ রেখেই হারারের ওলামায়ে কেরাম খ্রিষ্টান সম্রাটের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আর সম্রাট আশ্বাস দিয়েছিল, তার পক্ষ হয়ে লড়লে, হারার সম্পর্কে তিনি ভেবে দেখবেন। এ অঞ্চলকে বাড়তি কিছু অধিকার দেয়া যায় কি না!

জুলিকে ধরে আনা হয়েছিল ফ্রান্সের একটা গ্রাম থেকে। তার বাবা-মা দুজনেই মারা গিয়েছিলেন। তারা থাকত আলজেরিয়াতে। সেখানকার স্বাধীনতাকামীদের হামলায় দুজনই নিহত হয়েছিল। তার বাবা একজন সামরিক অফিসার ছিল। বাবা আর মায়ের মৃত্যুর পর তাকে দেখাশোনা করার মতো কোনও নিকটাত্মীয় ছিল না। প্যারিসের একটা গির্জা এ ধরনের বাচ্চাদের দায়িত্ব নিত। সে গির্জা থেকেই ভ্যাটিকান তাকে সংগ্রহ করে রোমে নিয়ে আসে। একটু বড় হওয়ার পর জুলি ভ্যাটিকান ছাড়তে চেয়েছিল, কিন্তু জোর করে তাকে আটকে রাখা হতো। সে আলজেরিয়া থাকাকালে ছোটবেলাতেই মুসলমান দেখেছে। আরব ও কালো মানুষ দেখেছে। তাদের প্রতি এক ধরনের ভালোলাগাও বোধহয় ছিল। অফিসে তাদের প্রতিটি পেশেন্টের জীবনবৃত্তান্ত পড়তে হতো। সেখানেই সে বিলালের দাদু সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছে। তারপর কাছে থেকে দেখে তার মুগ্ধতার মাত্রা বেড়েই চলেছিল। জুলি ভাবত, একটা মানুষ সারাদিন চুপচাপ থাকে কী করে? তার কথা বলতে ইচ্ছা করে না? আর মানুষটার শেখার ইচ্ছাও প্রশংসনীয়। হাসপাতালে শুয়ে-বসেও বিভিন্ন বই পড়ার চেষ্টা করে। ইতালিয়ান ভাষা শেখার চেষ্টা করে। ইংরেজি আগে থেকেই পারত, এখন আরও ভালো করার জন্যে চেষ্টা করছে! বেশ দ্রুত উন্নতিও করছে। আগে একটা বই পড়তে যা সময় লাগত এখন তা চেয়েও কম লাগছে।

চার্চের পক্ষ থেকে বাইবেল পড়তে দেয়া হতো। চার্চ আগে থেকে ঠিক করে রাখত, কাকে কোন ভাষাভাষীদের অঞ্চলে পাঠানো হবে! তাকে সে ভাষার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাইবেল দেয়া হতো। দীক্ষা ও শিক্ষা যেন একসাথে হয়ে যায়। বিলালের দাদাকে বাইবেল বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও ছিল জুলির ওপর। তার ভাষা ছিল ফ্রেঞ্চ। তাকেও ভবিষ্যতে ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষামিশ্রিত অঞ্চলে পাঠানোর জন্যে স্থির করে রাখা হয়েছিল। এখন পড়াতে গিয়ে, জুলিরও ইংরেজি ভাষাটা আরও সড়গড় হবে। নিজের শিক্ষা ও অন্যকে শেখানো একসাথে চলবে। বিলালের দাদা জুলির কাছে বাইবেল পড়তে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু না পড়ে উপায় নেই। পড়তেই হবে। চার্চের কথামতো না চললে, সোজা ব্যারাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অসুস্থ হলেও মাফ নেই। তাই বাধ্য হয়েই পড়তে হলো।

যতই দিন গড়াল, জুলি শিক্ষক থেকে কোন ফাঁকে শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়েছিল, সে টেরও পায়নি। খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে বিলালের দাদারও কম জানাশোনা ছিল না! এই হারার শত বছর ধরে মুসলিম অধ্যুষিত হলেও, আশেপাশের অঞ্চলগুলো খ্রিষ্টান অধ্যুষিত ছিল। আফ্রিকার প্রায় সব দেশ ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানদের নতুন উপনিবেশ হলেও, সেই প্রাচীনকাল থেকেই ইথিওপিয়াতে খ্রিষ্টানদের বসবাস! এ কারণেই বোধহয় ইউরোপিয়ানরা এদিকে খুব একটা লোভাতুর দৃষ্টি দেয়নি।

-তা হলে দাদু, ইতালি কেন দৃষ্টি দিয়েছিল?

-ইতালির মুসোলিনি ছিল স্বৈরাচার! সে ইউরোপের অন্য দেশের মতো আফ্রিকায় নিজের একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করতে চাচ্ছিল! কিন্তু সে বেশিদিন সুবিধা করতে পারেনি। কারণ, তাকে লিবিয়াতে মুজাহিদ বাহিনী ঠেকাতে প্রায় সর্বশক্তি ব্যয় করতে হচ্ছিল! আর এখানকার খ্রিষ্টান রাজাও মুসলিমদের প্রতি খড়্গহস্ত ছিল। তুমি কিছু মনে কোরো না, খ্রিষ্টান রাজাদের বদনামি তোমার কাছে খারাপ লাগতে পারে!

-না না দাদু! ইতিহাস তিক্ত হলেও মেনে নেয়াই যুক্তিযুক্ত!

-সম্রাট হাইলে সেলাস হারারের মুসলমানদের অত্যন্ত চাপের মধ্যে রেখেছিল। তোমাকে আগামীকাল নিয়ে যাব, দেখবে এখানকার বড় মসজিদটিকে খ্রিষ্টানরা কীভাবে গির্জায় রূপান্তরিত করেছে।

-সত্যিই?

-হুঁ, কাল নিজের চোখেই দেখতে পাবে! অথচ মসজিদটা ছিল অনেক পুরোনো! এসো, মূল ঘটনায় ফিরে যাই। চার্চের পক্ষ থেকে জুলি ও বেলালের দাদুকে পাঠানো হলো কানাডায়। আমি যে স্কুলে পড়তাম সেখানে। রেসিডেন্সিয়াল স্কুলগুলোর পক্ষ থেকে ভ্যাটিকানে শিক্ষক-শিক্ষিকা চাওয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হতো! এমনকি গির্জার ফুট-ফরমাশ খাটার জন্যে কাজের লোকও চাওয়া হতো! স্কুলের চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই জুলিকে শিক্ষিকা হিশেবে পাঠানো হলো। সাথে কাজের লোক হিশেবে বেলালের দাদাভাইকে।

- দাদাভাই ভ্যাটিকানের সব চাওয়া ও দাবি মেনে নিয়েছিলেন?

-বাহ্যিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন। না মেনে উপায় ছিল না। তাকে বলা হয়েছিল, বাড়ি ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। গেলেই সম্রাটকে বলে আবার ধরে আনা হবে। পাশাপাশি বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সবাইকে মেরে ফেলা হবে। এমন হুমকি পেলে কেই-বা ফিরে যেতে চায়। তিনি অগত্যা ঠিক করেছিলেন, অন্য কোথাও পালিয়ে যাবেন। চার্চ কর্তৃপক্ষ এটাও টের পেয়ে গিয়েছিল। তারা আগাম জানিয়ে রেখেছিল, যেখানে পাঠানো হচ্ছে সেখান থেকে পালালেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে!

-ইথিওপিয়ার সম্রাট ভ্যাটিকানের কথা মানবেন কেন?

-সব শেয়ালের এক রা! তলে তলে সবাই এক। আর সম্রাট হাইলে সেলাস নিজেকে সরাসরি নবী সুলাইমান আ. এর বংশধর মনে করে। তার সাথে খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের অনেক গোপন সংগঠনের যোগাযোগ আছে! তাকে ঘিরে একটা ধর্মমতই দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তাফারি। ওই যে একজন গায়ক ছিল না, নো ওমেন নো ক্রাই (নারী তুমি কেঁদো না), কী নাম যেন, বাড়ি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের জ্যামাইকাতে।

-বব মার্লে!

-ওমা, তুমি চেন তাকে?

-কেন চিনব না। ভালো করে চিনি। তিনি আমাদের কানাডাতে কনসার্ট করেছেন ১৯৭৯ সালে। আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে পড়ে, ডোনা। সে ববের অন্ধভক্ত। ডোনার বাড়ি ভ্যাঙ্কুবারে। তাদের শহরেও একটা কনসার্ট হয়েছিল। সেই আমাদের ববের কথা বলে। কালো মানুষদের ন্যায্য অধিকারের কথা, রেড ইন্ডিয়ানদের প্রতি বৈষম্যের কথা তার মুখেই শুনেছি। নিপীড়িত মানুষের প্রতি বব মার্লের সংগ্রামকে সে রীতিমতো পূজা করত। বব মার্লের মতো ডোনাও চুলকে জটাদার করে রাখত। সে আমাদের তার ধর্মমতের দাওয়াত দিত। রাস্তাফারা ধর্ম।

-ঠিক বলেছ। সম্রাট হাইলে সেলাসি হলো সে ধর্মের প্রধান পুরোহিত। ঈশ্বরের পুত্র। কালো মাসীহ। ব্ল্যাক যিশু। রাস্তাফারা ধর্ম খ্রিষ্টধর্মেরই নতুন আরেক রূপ। বব মার্লের মাধ্যমে এই ধর্মমত বিশ্বব্যাপী প্রচার পায়। জ্যামাইকা ছিল রাস্তাফারা [illegible]। আর ইথিওপিয়া তাদের কাছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রমিজ ল্যান্ড—ধর্মভূমি। সম্রাট নিজের ভক্তদের দেখা দেয়ার জন্যে তৎকালীন ব্রিটিশশাসিত জ্যামাইকা সফরেও গিয়েছিলেন।

-আচ্ছা, তারপর কী হলো?

-জুলি রোমে থাকতেই বিলালের দাদুর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সে ছোটবেলায় আলজেরিয়া থাকাকালে আরবী শিখেছিল। তাদের বাসায় এক মুসলিম দম্পতি থাকত। কাজের লোক হিশেবে। সে দম্পতিই তাকে লালন-পালন করেছিল। জুলির মা ছিল অত্যন্ত রোগা! এ জন্য তার বাবা দিনে মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের হত্যা করত, রাত মদ আর পরনারী নিয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকত। এদিকে জুলি বেচারা একা একা! তখন মুসলিম সে-ই দম্পতি তার দিকে স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিলো। অবশ্য তাদের প্রধান দায়িত্বই ছিল জুলির দেখাশোনা করা। সে-ই মুসলিম মহিলা তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। মায়ের অসুস্থতার সুযোগে তাকে আরবী শিখিয়েছে। আদব-লেহাজ শিখিয়েছে। আরও বহুকিছু। জুলি চার্চের কাছে আবেদন করেছিল, তাকে যেন আলজেরিয়াতে পাঠানো হয়। সেখানে চার্চের কাজ এখনো জোরালো না হওয়াতে পাঠানো গেল না। জুলি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, জীবনে একবার হলেও তার পালক মায়ের সাথে দেখা করবে। পারলে তাকে কাছে এনে রাখবে। তার সুযোগ-সুবিধা দেখবে। তাকে না পেলে তার ছেলেসন্তানকে। বেলালের দাদাভাইকেও বলে রেখেছিল, সে যদি কোনও কারণে যেতে না পারে, তার বদলে বিলালের দাদাভাই যেন পালক মাকে খুঁজে বের করে।

কানাডায় বিলালের দাদাভাইয়ের কাজ ছিল চার্চ ও স্কুলের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তদারক করা। চার্চের প্রার্থনাসভা প্রস্তুত রাখা। স্কুলের ছেলেমেয়েদের ওপর গোপনে নজর রাখা। তাদের আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ রাখা। কাজটা পছন্দ না হলেও করতে হতো। এখানে আসার পর বাড়তি সুবিধা এটুকু হয়েছে, আগের মতো বন্দী হয়ে নির্দিষ্ট একটা চৌহদ্দির ঘেরাটোপে অন্তরীণ হয়ে থাকতে হয় না। চার্চের কাজ করলেও নিজের একান্ত কিছু সময় থাকে। গোপনে কিছু করতে চাইলে সুযোগ আছে।

কানাডা আসার পর, জুলির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেছে। শুধু রোববারে চার্চে দেখা করা সম্ভব হয়। তাও একটুখানি সময়ের জন্যে। বাকি দিনগুলো দুজন বিচ্ছিন্ন। অল্প যেটুকু সময় পাওয়া যায়, সেটাও-বা কম কী! জুলি বার বার বলছে, দুজন মিলে কোথাও পালাতে! সেটা সম্ভব নয়। পালালেই হারারের মানুষগুলোকে কষ্ট দেয়া হবে। এখানেই থাকতে হবে। কোথাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যেতে হলে এখানকার অনুমোদনক্রমেই যেতে হবে। এক রোববারে বেলালের দাদাভাইয়ের কাছে জুলি বলল :

-আমাকে একজন ফাদার খুব বেশি উত্ত্যক্ত করছে! তিনি স্কুলে অঙ্ক পড়ান! তার অনেক দাপট। আমাকেও তার সহকারী হিশেবে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি রেড ইন্ডিয়ান মেয়েদের ওপর অসমীচীন আচরণ করেন। আমি এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। তিনি রেগেমেগে আমার ওপরই চড়াও হতে উদ্যত হয়েছেন। তার সাথে আরও সহযোগী আছে। তারাও ফাদারকে পাপকার্যে সহযোগিতা করে!

-তুমি সাহস হারিও না জুলি! আমি দেখি কী করা যায়! এখানে আসার পর থেকেই অনেক কিছু চোখে পড়ছে! এর তুলনায় ভ্যাটিকানকে নিষ্পাপ বলা যায়! এভাবে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ওপর নির্যাতন করা যায়? কোনও মানুষ করতে পারে? এরা নাকি ফাদার! এরা নাকি নান!

-দাদু তুমি তখন ও স্কুলে পড়তে না?

-জ্বি পড়তাম!

-বিলালের দাদার সাথে কীভাবে পরিচয়?

-রোববারে চার্চে পুরো স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবাই প্রার্থনাসভায় উপস্থিত হতো। আমিও সে রোববারে হাজির হয়েছিলাম। ফাদার মূল প্রার্থনা শুরু করার পর আমার একটু বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। আমি সন্তর্পণে বের হলাম। তাড়াহুড়ার কারণে ভুলে আরেক দরজায় দিয়ে ঢুকে পড়লাম! অবাক হয়ে দেখি সিস্টার জুলিকে কী যেন লিখে লিখে শেখাচ্ছেন মি. জ্যাকব!

-মি. জ্যাকবই বুঝি বিলাল ভাইয়ার দাদাভাই?

-জ্বি। আমাকে দেখেই মি. জ্যাকব ধড়মড় করে কাগজটা লুকিয়ে ফেললেন! সিস্টার দৌড়ে এসে আমাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমার দুহাত চেপে ধরে ভীত স্বরে বললেন,

-তুমি এখানে যা দেখলে, তা কারও কাছে বোলো না! তোমার কাছে মিনতি করছি!

***

সিস্টার জুলিকে এমনিতেই আগে থেকে ভালোবাসতাম। পুরো রেসিতে একমাত্র তিনিই আমাদের প্রতি সদয় নরম আচরণ করতেন। অন্য সবার মতো জুলুম করতেন না। কথায় কথায় পিটুনি লাগাতেন না। খুবই মমতা দিয়ে অঙ্ক শেখাতেন। সেদিনের ঘটনার পর থেকে তার প্রতি কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল। তিনিও আমার প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিতেন। আড়ালে-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আবডালে ডেকে কথা বলতেন। তার ফরমাশ খাটানোর ছলে তার কক্ষে ডেকে নিতেন। দরজা বন্ধ করে গল্প করতেন। কিন্তু আমি শত চেষ্টা করেও তারা সেদিন কী পড়ছিলেন, তা বের করতে পারিনি। অনেক পরে বিলালের দাদা ভাইয়ের কাছে জেনেছিলাম!

-কী করছিলেন?

-সূরা ফাতিহা পড়ছিলেন। বিলালের দাদু নিজের হাতে লিখে মিস জুলিকে শেখাচ্ছিলেন। তাদের দেখলে পাক্কা খ্রিষ্টান ছাড়া আর কিছু মনে হতো না! তাদের বিয়ের কথা জানতে পেরেছিলাম আরও বহু পরে। এখানে চলে আসার পর। আমি তখনো ইসলাম কী, মুসলমান কী, কুরআন কী, কিছুই জানতাম না। আমরা জানতাম যিশুর কথা। বাইবেলের কথা। খ্রিষ্টবাদের কথা। মেরির কথা। বিশ্বে আর কোনও ধর্মের অস্তিত্ব আছে, সেটা প্রথম জেনেছি মিস জুলির কাছে। মি. জ্যাকবকে আমরা বোকাসোকা একজন কালো মানুষ বলে ধারণা করতাম। থাকতেনও অমন করে। পরে বুঝেছিলাম, সেটা ছিল তার অভিনয়। ভেতরে ভেতরে তিনি আমাদের অনেক সহযোগিতা করতেন। সেটা আমরা কিছুতেই টের পেতাম না। তার দায়িত্ব ছিল আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা। তিনি আমাদের মার খাওয়ানোর হাজারো সুযোগ পেয়েও কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করতেন না। আমরা আস্তে আস্তে তার মমতাপূর্ণ হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছিলাম। কিন্তু বাইরে বাইরে তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত কঠিন আচরণ করতেন।

***

সিস্টার জুলির সাথে আমার সম্পর্ক এমন হলো, প্রতিদিনই তার সাথে কোনও না-কোনো ছুতায় গল্প করতে যেতাম। বিকেলে আমরা বাগানে পানি দিই। মিস জুলি সাথে থাকেন। একদিন আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তার দেখা নেই। তার পরদিনও দেখা নেই। আমরা ভেবেছি তিনি অসুস্থ। তার ঘরে গেলাম। তালা ঝুলছে। টনক নড়ল। কী ব্যাপার? কোথায় যেতে পারেন? কোথাও গেলে আগে থেকে একটু আভাস তো দেবেন। আমি তখন রেসির শেষ ক্লাসে পড়ি। আগামী বছর বের হয়ে যাব। মুক্ত পৃথিবীতে। অন্যদের তুলনায় আমাদের কিছু চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল। আমি এক ফাঁকে মি. জ্যাকবের কাছে গেলাম। তিনি আমার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। তিনিও জানেন না। সেই গত রোববারে চার্চের সময় দেখা হয়েছিল। এরপর আর দেখা বা কথা কোনওটাই হয়নি।

তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কিন্তু কারও কাছে সেটা প্রকাশও করতে পারছিলেন না। একদিন দুদিন করে সপ্তাহ কেটে গেল। মিস জুলির দেখা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নেই। কর্তৃপক্ষেরও এ ব্যাপারে কোনও হেলদোল দেখা গেল না। পরে চাপা ফিসফাস থেকে জেনেছিলাম, আমাদের অঙ্কের টিচার ফাদারই মিস জুলির সাথে দুর্ব্যবহার করে তাকে গুম করে ফেলেছিলেন। এমন গুমের ঘটনা একটা দুটো নয়। রেড হাজারো ইন্ডিয়ান ছাত্র-ছাত্রীকে নির্যাতন করে গুম করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ভ্যাটিকান থেকে পাঠানো শিক্ষিকাকেও? আমরা আর কোনও খবর জানতে পারিনি। স্কুল থেকে বের হওয়ার পরও আমি চেষ্টা করেছিলাম। কোনও সূত্র বের করতে পারিনি। তবে ঘটনাটার কথা ঊর্ধ্বতন মহল বিলক্ষণ জানতেন। পরে তার প্রমাণ পেয়েছি।

***

এ ঘটনার পর মি. জ্যাকব ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি ও কয়েকজন ছেলেমেয়ে গোপনে তার সেবা করতাম। তখন আমি তাকে আরও ভালো করে চিনতে পারি। তার সুন্দর মনের পরিচয় পাই। আমি একদম বাচ্চাকাল থেকেই রেসিতে বন্দী। বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কোনও খবর জানতাম না। চার্চের বর্বর ফাদার ও পশুহৃদয় শিক্ষকদের দেখে দেখে মনে হয়েছিল, সব পুরুষই বুঝি এমন? শুধু পুরুষই কেন, সব শাদা নারীও বুঝি এমন হিংস্র আর জানোয়ার স্বভাবের হয়ে থাকে? মি. জ্যাকবকে দেখে ভুল ভাঙল। তখন আমি সদ্য কৈশোর পার হয়ে এসেছি। মনে অনেক রঙিন কল্পনা। একজন ব্যতিক্রমী পুরুষ দেখে মনের অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেল। হোক না কালো! হোক না মানুষটা আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়।

***

আমার স্কুলের পাঠ চুকল। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলল, চার্চের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। আমি রাজি হলাম না। পরে মনে হলো, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে মি. জ্যাকবকে হারাতে হবে। আবার থাকলেও বদচরিত্র ফাদারদের হাতে সবকিছু হারানোর ভয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একবছর থাকার শর্তে রাজি হলাম। দেখতে দেখতে বছরটা কেটে গেল। মি. জ্যাকবকে সব সময় কাছে পেয়েছি। তার সহযোগিতা পেয়েছি তাই সময়টা কাটাতে কষ্ট অনুভব হয়নি। মিস জুলি গুম হওয়ার পর, চার্চের সেবিকাদের সাথে দুর্ব্যবহারের মাত্রা কমে এসেছিল। ভ্যাটিকান থেকে নাকি প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল। মিস জুলির অন্তর্ধানরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। তাদের কী বুঝ দেয়া হয়েছিল জানিনি, তবে রেসি কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। ভালোয় ভালোয় সময়টুকু কেটে গেল।

***

মুক্ত দুনিয়াতে বের হয়ে এলাম। মি. জ্যাকব অনেক সাহায্য করলেন। তিনি স্কুলের কাজে প্রায়ই শহরে যেতেন। তার সাথে অনেক কালো মানুষের পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাদের সূত্রে আমার থাকা ও খাওয়ার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বন্দোবস্ত হলো। পড়াশোনার ব্যবস্থা হলো। নির্যাতিত রেড ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন সংগঠনের সাথেও যোগাযোগ গড়ে উঠল। আমরা বাইরে বেরিয়ে আসলেও কেন্দ্রীয় চার্চের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হতো। অনেকটা আদালতে হাজিরা দেয়ার মতো। চার্চের পক্ষ থেকে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলো, আমি আফ্রিকার গরিব কোনও দেশে সেবার জন্যে যেতে আগ্রহী কি না! মি. জ্যাকবের সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি সম্মতি দিলেন। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম :

-আফ্রিকার কোন দেশে কাজ করতে পারি?

-তোমাকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিয়েছে?

-পরিষ্কার করে কিছু না বললেও, মনে হয় বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

-আমার মনে হয়, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতেই তোমাদের পাঠানো হবে। কোনওভাবে চেষ্টা করে দেখবে, গন্তব্যের তালিকাতে ইথিওপিয়ার হারার অঞ্চল আছে কি না। যতদূর জানি থাকার কথা। কারণ, সেখানে বড়সড় একটা চার্চ খোলা হয়েছে। একটা মসজিদকে জোর করে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। গির্জার পক্ষ থেকে একটা স্কুলও খোলা হয়েছে।

***

আমার আবেদন মঞ্জুর করা হলো। আমি পরিচিত এক প্রভাবশালী নানের মাধ্যমে আবেদন করলাম, আমার ওখানে কাজ করার সুবিধার্থে একজন লোকাল গার্জেন প্রয়োজন।

-তুমি ওখানে গিয়ে কাজ শুরু করলে, এমনি এমনি অনেক গার্জেন তৈরি হয়ে যাবে।

-একজন লোককে সাথে নিতে পারলে, চার্চ ও স্কুলের অনেক কাজ হবে। তিনি যিশুর একনিষ্ঠ অনুসারী। তাকে পেলে কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তিনি ওখানকার প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে। তিনি যিশুর অনুসারী হয়েছেন দেখলে, মানুষ দলে দলে তার অনুসরণ করবে!

কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকলাম। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর চার্চ রাজি হলো। স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে কিছুতেই মি. জ্যাকবকে ছাড়তে রাজি হয়নি। ব্যাপারটা ভ্যাটিকান পর্যন্ত গড়িয়েছে। কিন্তু ভ্যাটিকান তখন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিল বিধায় এদিকে মনোযোগ দিতে পারেনি। এদিকে মি. জ্যাকবও কর্তৃপক্ষকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, তাকে সুন্দরভাবে ছাড়পত্র না দিলে, ব্যাপারটা কোর্ট পর্যন্ত গড়াবে! ব্যস অমনি কাজ হয়ে গেল। আমরা চলে এলাম হারার। মি. জ্যাকব অল্পবয়েসী কেউ হলে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানুষ অন্যরকম কিছু সন্দেহ করতে পারত! তিনি কালো, তার ওপর তিনি আমার বাবার বয়েসী। হিশেব করলে দেখা যাবে, আমার বাবার চেয়েও বড়। তাই তাকে সাথে নিয়ে আসার আবেদনে লোকজনের মনে ভিন্ন কিছু জাগল না।

বিলালের দাদার বাবা-মা কেউই বেঁচে ছিলেন না। বাবা শহীদ হয়েছিলেন ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে। মা মারা গিয়েছেন স্বামী-পুত্রের শোকে ধুঁকতে ধুঁকতে। তিলে তিলে। তবে জমিজমা সব ঠিকঠাক ছিল। এখানকার মানুষ বেশ সৎ আর ধার্মিক। শত বছর ধরে তাদের মধ্যে নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালনের ব্যাপারটা চলে আসছে। আমি হারার আসার পর ইসলাম নিয়ে একমনে পড়াশোনা শুরু করলাম। চার্চে থাকাকালে আমি ধার্মিক খ্রিষ্টান হয়ে থাকতাম। বাইরে বের হয়ে এলে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ ছিল। এখানে একটা লাইব্রেরি ছিল। আফ্রিকার এতটা ভেতরে এমন লাইব্রেরির প্রচলন অবিশ্বাস্য। অত্যন্ত সমৃদ্ধ এক লাইব্রেরি। সেখানে নিয়মিত পড়াশোনা করতে যেতাম। লাইব্রেরির পরিচালকও ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তার সাথে কথা বলে, ইসলাম, আফ্রিকা, উপনিবেশ, শাদাদের নিপীড়ন সম্পর্কে অনেক অজানা ইতিহাস জানতে পেরেছি।

শুরু হলো স্কুলের কাজ। আগে থেকেই কার্যক্রম চালু ছিল। আমরা এসে নতুন করে ঢেলে সাজালাম। এখানে আগে নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। হারার আসার আগে আমাকে ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো সম্পর্কে ভালো করে ধারণা দেয়া হয়েছিল চার্চের পক্ষ থেকে। সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছিলাম। কাজের সুবিধা হবে, এই ছুতা দিয়ে চার্চের কাছে আরবী শেখার বায়না ধরেছিলাম। তারা রাজি হয়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কারণ, হারারের মানুষের মধ্যে আরবী জানা লোককে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা ছিল।

গরিব দেশগুলোতে আমরা সাধারণত দেখি, পুরুষরা শিক্ষাদীক্ষায় নারীদের তুলনায় এগিয়ে থাকে। হারার ছিল তার সম্পূর্ণ উল্টো। এখানে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি এগিয়ে ছিল। বড় বড় মহিলা মাদরাসা ছিল। সেই শত শত বছর আগে থেকে ঘরোয়াভাবে এই মাদরাসাগুলোর কার্যক্রম চলে আসছে। সম্রাট হাইলে সেলাস ক্ষমতায় বসেই মাদরাসাগুলো বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল। কয়েক দশক ধরে মহিলা মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে ছিল। তা সত্ত্বেও ঘরোয়াভা[illegible] অবিরত বহমান ছিল। কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে না হলে, কাজের গতি কমে একসময় যতি পড়ে যায়। এখানেও তা-ই হয়েছিল। চার্চ কর্তৃপক্ষ বুদ্ধি করে মেয়েদের জন্যে আবাসিক স্কুল খুলেছিল। কিন্তু খ্রিষ্টবাদ শিক্ষা দেয়ার অপবাদে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখন নতুন করে শুরু করতে সমস্যা হচ্ছিল। তবুও দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ শুরু হলো। আমরা বুদ্ধি করে স্কুলটা শুরু করলাম আগের স্কুলভবনকে বাদ দিয়ে নতুন আরেক স্থানে।

আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। বিলালের দাদাভাই তখনো নিজেকে সবার কাছে খ্রিষ্টান হিশেবেই দেখাচ্ছিল, নইলে সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মানুষ আমাদের প্রচারণায় কিছুটা আস্থার পরিচয় দিলো। একজন দুজন করে ছাত্রী দিতে শুরু করল। না দিয়ে আসলে উপায় ছিল না। মেয়েদের পড়াশোনার ভালো কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সরকারের কঠিন নজরদারির চাপে, মেয়েদের মাদরাসাগুলো বন্ধ থাকার কারণে, কিছু পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া ভালো করে হলেও বেশির ভাগ পরিবারের অবস্থা ছিল শোচনীয়। মেয়েদের মাদরাসা নিষিদ্ধ করার মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। মেয়েদের ধর্মীয় চেতনা কমে গেল। পরিবারগুলোতে ধর্মীয় মূল্যবোধে ধস নামল। আমি দেখেছি, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত। এ জন্য পুরুষরাও যোগ্য হয়ে বেড়ে উঠতে পেরেছিল। চারপাশে খ্রিষ্টানদের এত শক্তিমত্তা সত্ত্বেও হারারেতে শত বছর ধরে ইসলাম এত গভীর প্রভাব নিয়ে বিদ্যমান থাকার প্রধান কারণও ছিল এখানকার অনন্য সাধারণ মহিলা মাদরাসাগুলো।

আমি অভিজ্ঞ ও বয়স্কদের সাথে কথা বলে, আগের শিক্ষাব্যবস্থাটা ভালো করে জেনে নিয়েছিলাম। সত্যিই অবাক করার মতো ঈর্ষণীয় একটা ব্যবস্থা ছিল। হারারে ইসলাম টিকে থাকার প্রধান ভূমিকা মহিলাদেরই ছিল।

-কীভাবে? আমি তো শুনেছি, মুসলিম সমাজে মেয়েরা খুব পিছিয়ে থাকে!

-নাহ, এটা সর্বৈব সত্য নয়। তবে এটা সত্য, ধর্মীয় পরিবারগুলোতে মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে পিছিয়ে থাকে! তার মানে এই নয়, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম শিক্ষিত বা কম যোগ্য! ধর্মীয় পরিমণ্ডলে মনে করা হয়, মেয়েদের দায়িত্ব হলো ঘর সামলানো! ভালো মা হওয়া! ভালো স্ত্রী হওয়া। এসব হতে গেলে একজন মেয়েকে অনেক বেশি যোগ্য হতে হয়। এই যোগ্যতা স্কুল-কলেজ-মাদরাসার চার দেয়ালের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এটা অর্জন করতে হয় ঘরোয়া আবহে। তুমি যদি কাগজের সার্টিফিকেট দিয়ে ধর্মীয় ঘরানার নারীদের যোগ্যতা বিবেচনা করো, তা হলে এককথায় তাদের পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে বলে ঘোষণা দিয়ে বসবে। কিন্তু একটা সুন্দর পরিবার গড়ে তোলা, সন্তান লালন-পালন করা, একজন ভালো আদর্শ স্ত্রী হওয়ার দিকটা বিবেচনা করলে, পুরুষকে নারীর তুলনায় রীতিমতো মূর্খই মনে হবে। কারণ, একজন আদর্শ মুসলিম স্ত্রী একসাথে এতগুলো দিক সামাল দেয়, একজন মুসলিম পুরুষ কল্পনাও করতে পারবে না!

একজন আদর্শ মুসলিম নারী ও মুসলিম পুরুষের যোগ্যতাকে হিমশৈলের সাথে তুলনা করা যায়! একটা হিমশৈলের বেশির ভাগই পানির তলে ডুবে থাকে। সামান্য একটু অংশ পানির ওপরে ভেসে থাকে। তোমার বোঝার জন্যে বলছি, একটি মুসলিম পরিবারে একজন নারীর পরিশ্রম ও ভূমিকা পানির নিচে ডুবে থাকা হিমশৈলের মতো।

-আর পুরুষের ভূমিকা ভেসে থাকা অংশের মতো?

-ঠিক তা-ই। তার মানে এই নয়, মুসলিম পরিবারে পুরুষের ভূমিকা একেবারেই গৌণ!

-হিমশৈলের তুলনা কি তা হলে ভুল?

-নাহ, ভুল নয়। একটু ভেবে দেখো, একটা সন্তানকে গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে প্রায় তিন কি চার বছর পর্যন্ত শিশুকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে বাবার ভূমিকা কেমন? একদম হিমশৈলের মতোই নয় কি?

-জ্বি দাদু! এবার ঠিক বুঝেছি! হারারের মুসলিম নারীদের শিক্ষাব্যবস্থাটা কেমন ছিল?

-সে এক অনন্য শিক্ষাব্যবস্থা। মোটা দাগে কয়েকটা দিক তুলে ধরলে বুঝতে পারবে!

১. আমি হারারে এসে প্রথমে যে লাইব্রেরিতে পড়তে যেতাম, সেটা ছিল ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা। তোমাকে আগামীকাল নিয়ে যাব ওখানে। ওই লাইব্রেরিতে বেশির ভাগ পুথি-পুস্তক, কিতাবপত্রই মেয়েদের হাতে লেখা। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, হাতে লেখা হলেও, ছাপার অক্ষরের মতো গোট গোট আর পরিচ্ছন্ন! প্রতিটি পাণ্ডুলিপিই পরিকল্পিত আর গোছালো। পাঠকের পড়তে কোনও সমস্যাই হয় না। আরও অবাক করা বিষয় হলো, লিপিকর মেয়েটি আন্ডারলাইনে কঠিন স্থানগুলো সম্পর্কে নিজের বক্তব্যও যোগ করে দিয়েছে।

২. হারারের প্রতিটি মুসলিম মেয়ে জন্মের পর থেকেই বিশেষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠত। সন্তানসম্ভবা মাকে সব সময় বিভিন্ন আমল, কুরআন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিলাওয়াত, দ্বীনি আলোচনার মধ্যে রাখা হতো। তার ঘরের কাজ কমিয়ে দেয়া হতো। আশেপাশের প্রতিবেশিনীরা এসে তাকে সাহায্য করত।

৩. নবজাতক দেখাশোনার জন্যে প্রতিটি মহল্লায় দুটি সম্মিলিত ঘর থাকত। একটা ছেলেসন্তানের জন্যে আরেকটা মেয়েসন্তানের জন্যে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম কয়েকদিন সেই সূতিকাগার নবজাতকের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করত। মা প্রসবজনিত ধকল কাটিয়ে ওঠা পর্যন্ত শিশুকে সূতিকাগারই দেখাশোনা করত।

৪. পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় কিছু ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল। কোনও বাড়ি ছিল এক নম্বর বাড়ি, কোনওটা দুই নম্বর বাড়ি! এভাবে দশ পর্যন্ত থাকত। এক নম্বর বাড়ি মানে, ও বাড়িতে একজন বা একাধিক অভিজ্ঞ মহিলা আছেন, তারা এক বছর বয়েসী শিশুদের বিষয়ে যাবতীয় পরামর্শ দেবেন। পাড়ার সমস্ত এক বছর বয়েসী শিশুদের খোঁজখবর রাখবেন। বিশেষ করে মেয়েদের। দুই নম্বর বাড়ি মানে দুই বছর বয়েসী শিশুদের দায়িত্বপ্রাপ্তা।

৫. এই বাড়িগুলোর অভিজ্ঞ মহিলারা শুধু খোঁজখবরই রাখতেন না। শিশুদের লেখাপড়া-শিক্ষাদীক্ষার দিকটাও দেখতেন। একটু বুঝ হওয়ার পর থেকেই শিশুদের তাদের কাছে দিনের কিছু সময়ের জন্যে রেখে আসা হতো। শিশুরা সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করত। পাশাপাশি টুকটাক মৌখিক শিক্ষাও চলত। শিক্ষাটা কিছুতেই গৎবাঁধা পদ্ধতিতে হতো না। খেলাধুলা আর হই-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে হতো।

৬. একটা অদ্ভুত কাজও করা হতো, মাঝেমধ্যে দিনের কিছু সময় তিন বছর বয়েসীদের দুই বছর বয়েসীদের সাথে রাখা হতো! কখনো তিন বছরের শিশুকে চার বছর বয়েসীদের সাথে রাখা হতো। মানে ছোটদের বড়দের সাথে, বড়দের ছোটদের সাথে রাখা।

-এটা কেন করা হতো?

-বড়রা গত বছরগুলোতে যা শিখেছে, ছোটদের সেটা খেলাধুলার ছলে শিখিয়ে দেবে। ছোটরা বড়দের কাছ থেকে শিখে নেবে। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করবে। বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে।

৭. মেয়েদের পাঁচ বছর বয়েস থেকেই ছেলেদের থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। শিক্ষা থেকে শুরু করে সবই পৃথক। তবে ব্যতিক্রমী নিয়মও ছিল।

-সেটা কী?

-এখনো পর্দা ফরয হয়নি, দেখা দেয়া জায়েজ, এমন ছেলেমেয়েকেও সপ্তাহের একটা সময় একসাথে রাখা হতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-কেন?

-ছেলেরা বাইরে ঘোরার সুযোগ পায়। মেয়েরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। ছেলেমেয়ে একদম পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা হলে, পুরুষের কিছু অভিজ্ঞতা থেকে মেয়েরা বঞ্চিত থেকে যায়। আবার একটা মেয়ের সাথে কেমন আচরণ করবে এটাও ছেলেদের শেখা উচিত। সুস্থ সুন্দর গড়ে তোলার জন্যে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক এই লেনদেনটা জরুরি। হারারেতে এটা ছিল সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মতভাবে। পর্দা করার বয়েস হয়ে গেলে, আর মিশতে দেয়া হতো না।

৮. আরেকটা নিয়মও বিস্ময়কর ছিল। এখানে বিয়ের বয়েস হলেই বিয়ে করিয়ে দেয়া হতো। দেখা যেত ছেলে ও মেয়ে দুজনেই এখনো পড়াই শেষ করেনি, অথচ তাদের সন্তান হয়ে গেছে। এ পদ্ধতির কারণে হারারী সমাজে গুনাহের পরিমাণ ছিল না বললেই চলে।

৯. ছয়, সাত বা আট বছর থেকেই মেয়েদের আলাদা মাদরাসায় দেয়া হতো। আবাসিক-অনাবাসিক দুই পদ্ধতির মহিলা মাদরাসাই ছিল। মাদরাসা বলতে প্রচলিত স্কুল সিস্টেমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ছিল না সেগুলো।

১০. মাদরাসাগুলোকে বলা হতো, 'মাদরাসাতুল উম্ম'। মায়েদের মাদরাসা। আসলেও মায়েদের মাদরাসাই ছিল। বইপত্র পড়ানোর চেয়ে মৌখিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। আর মাদরাসার পড়াশোনা শ্রেণিভিত্তিক ছিল না, ছিল বিষয়ভিত্তিক। পড়ার বিষয়ও খুব বেশি ছিল না। কুরআন কারীম, হাদীস শরীফ, নারীবিষয়ক ফিকহ, আকীদা, সীরাত, মহীয়সীদের জীবনী।

১১. পরীক্ষা খুব বেশি গুরুত্ব পেত না। একটা বিষয়ে দক্ষ হয়েছে কি না, সেটা যাচাই হয়ে যেত, নিজের চেয়ে ছোটদের পড়াতে গিয়ে। প্রতিটি ছাত্রীই একই সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকা। তাদের পড়ার বিষয় ছিল কম। তাই প্রতিটি বিষয় খুবই ভালোভাবে আয়ত্ত হয়ে যেত। একটা বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ত না হলে, আরেকটা বিষয়ে জোর দেয়া হতো না। মাদরাসাতুল উম্মে গ্র্যাজুয়েশন পদ্ধতি ছিল না। মানে এসএসসি, অনার্স, মাস্টার্স এমন পরিভাষা ছিল না। তাদের মধ্যে ছিল কুরআনের হাফেজা। বুখারী শরীফের হাফেযা। এ ধরনের পরিভাষাতেই তাদের শিক্ষা আর যোগ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করা হতো।

১২. সংসারে কাজে লাগবে এমন বিষয়গুলোর প্রতি বেশি জোর দেয়া হতো স্কুলে। সেলাই, রান্নাবান্না, রাগদমন, ধৈর্য-সবর, পর্দাপুশিদা, স্বামীভক্তি, শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধা। সন্তান লালনপালন ইত্যাদি।

১৩. মাদরাসাতুল উম্ম এর ছাত্রীরা নির্দিষ্ট একটা সময় কাটাত নম্বরধারী বাড়িগুলোতে। অভিজ্ঞ মহিলাদের সাথে থেকে ছেলে-মেয়েদের পড়াত। কিছু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সময় কাটাত 'সূতিকাগারগুলোতে'। নবজাতকের প্রতিপালন পদ্ধতি হাতেকলমে শিখতে।

১৪. হারারি মুসলিমসমাজে একাধিক বিয়েরও বেশ প্রচলন ছিল। মেয়েরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে স্বামীকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করত। তাদের মাদরাসা থেকেই এ ব্যাপারে যাবতীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে দেয়া হতো। তাদের মন-মানসিকতা তৈরি করে দেয়া হতো। সব পুরুষই একাধিক বিয়ে করত এমন নয়। বহু বিয়ের প্রথা সচল থাকার কারণে, ঘরে নারীরা সাংসারিক কাজ, সন্তান লালনপালন ও স্বামীর সেবায় চাপমুক্ত থাকতে পারত। পাশাপাশি পুরুষরাও পাপচিন্তা থেকে বেঁচে থাকতে পারত। এক বিবি সংসারের কাজে থাকলে বাকি বিবিরা শিক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকত।

১৫. হারারি মুসলিম মেয়েদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো, তাদের হস্তলিখিত কুরআন শরীফ, হাদীসের কিতাবাদি ও অন্যান্য কিতাব। হারারে যত কিতাবাদি পড়ানো হতো, সবই আসত মেয়েদের পক্ষ থেকে। প্রতিটি ঘরেই মেয়েরা দিনের একটা অংশ কাটাত কুরআন কারীম লিখে। মেয়েদের হাতের লেখার শিল্পটা উৎকর্ষের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। হারারের বিভিন্ন লাইব্রেরি দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

-আচ্ছা দাদু, আপনাদের গার্লস স্কুলটাও কি এমন ছিল?

-প্রথম প্রথম ছিল না। পরের দিকে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের পর আমরা চেষ্টা করেছিলাম পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সম্রাটের বিধিনিষেধের কারণে হয়ে উঠছিল না। চার্চও বিষয়টাকে ভালোভাবে নিত না। তাই আমরা মধ্যপন্থা ধরে এগুচ্ছিলাম।

-আপনাদের বিয়েটা কখন হলো?

-ও সেটা শোনার জন্যে বুঝি আর তর সইছে না? আমরা যখন কানাডা থেকে এলাম, তিনি কিছুদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন। পরে বলেছেন, হারারের বাইরে এক পাহাড়ে একজন শায়খ থাকেন। তার কাছে গিয়েছিলেন দ্বীনের ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো নতুন করে শিখে নিতে। পাহাড়বাস থেকে ফেরার পর, খেয়াল করলাম তিনি আমার মুখোমুখি না হয়ে শুধু পালাই পালাই করে বেড়াচ্ছেন। অবাক হয়ে একদিন মুখোমুখি হলাম। তিনি বললেন :

-দেখো, তুমি ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জেনেছ। আমি বাইরে খ্রিষ্টান হলেও, ভেতরে ভেতরে মুসলিম, সেটাও জানো। এটাও জানো, ইসলামী শরীয়তমতে আমাদের একসাথে কাজ করা বৈধ নয়। এতদিন করেছি বিপদের আশঙ্কায়। প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল। এখনো আছে। কিন্তু তুমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাকে অন্য কাজ দাও। সেখানে মেয়েদের সাথে একসাথে কাজ করতে হবে না।

-এ সমস্যার সমাধান অন্যভাবে করা যায় না?

-কীভাবে?

-মিস জুলির ব্যাপারে যেভাবে করেছিলেন?

-নাহ ওটা সম্ভব নয়!

-কেন সম্ভব নয়? যা হয়েছে, তারপর আমার আর বিয়ে করা চলে না!

-কেন? ইসলামে নিষেধ আছে?

-না, তা কেন থাকবে!

-তা হলে?

-প্রথমত অন্য কোনও নারীর প্রতি আগ্রহ খুঁজে পাই না। আর সব সময় জুলির কথা মনে পড়ে। এমতাবস্থায় আরেকজনকে বিয়ে করলে, তার প্রতি সুবিচার করতে পারব না। কেন জেনেশুনে একজনের সাথে বেইনসাফি করতে যাব? আর আরেকটা বিষয় তুমি বুঝতে পারছ না!

-কোন বিষয়টা?

-আমি তোমার চেয়ে কত বড় সেটা হিশেব করে দেখেছ?

-সে তো কবেই দেখেছি! যেদিন মিস জুলির হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ পেলাম সেদিনই। আসলে বলা ভালো, যেদিন প্রথমবার আপনাদের দুজনকে চার্চের পাশের ঘরে একান্ত নিবিড় হয়ে সূরা ফাতিহা পড়তে দেখেছি সেদিন থেকেই!

-কী বলছ তুমি?

-আমরা রেসি স্কুলে থাকতে মনে করতাম, পুরুষ মানেই বর্বর! জানোয়ার! কারণ, ফাদার থেকে শুরু করে দারোয়ান-মালি পর্যন্ত সবাই আমাদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত। আপনাদের দুজনকে দেখার আগে, একজন পুরুষ একটি মেয়ের সাথে এতটা মমতা দিয়ে কথা বলছে, এটা জানা ছিল না। কল্পনায়ও ছিল না।

-তুমি তখন কিশোরী ছিলে! মনটাও নরম ছিল! মনে রং ধরতে শুরু করছিল। সেটা ছিল প্রথম ভালো লাগা! তাই আমার অন্য কিছু বা বাস্তবতা তোমার চোখে পড়ছে না।

-চোখে না পড়লে না পড়ুক! আমি অন্ধ হয়েই থাকতে চাই! মিস জুলি হারিয়ে যাওয়ার পরই আমি ঠিক করেছিলাম, বাকি যেকোনও মূল্যে আপনার সাথেই থাকব! আমি নিয়মিত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এসেছি এ জন্য। এমনকি আপনার ও মিস জুলির 'আল্লাহর' কাছেও আমি নিয়মিত প্রার্থনা করেছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-এটা কিন্তু তোমার বোকামি! আরও ভেবে দেখো! বিয়েটা হলে তুমি কতকিছু হারাবে? চার্চ থেকে বহিষ্কৃত হবে! বন্দী হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়!

-মরে গেলেও আমার আপত্তি নেই।

-তুমি জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইলে, আমার কীই-বা করার আছে!

***

জুমাইমা বলল,

-তা হলে এরপরই বিয়ে হয়ে গেল?

-জ্বি। প্রথমে গোপন ছিল। নিরাপত্তার স্বার্থে। এমনিতেই চার্চের লোকজন আমাদের সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে যখন সম্রাট হাইলে সেলাসির ক্ষমতা কমে আসছিল তখন থেকে আমরা আস্তে আস্তে চার্চ থেকে আলাদা হতে শুরু করেছি। ১৯৭৪ সালে সম্রাটকে গদিচ্যুত করা হয়। তার পরপরই আমরা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিয়েছি। আমাদের স্কুলকেও পুরোপুরি চার্চ থেকে আলাদা করে ফেলেছি। স্কুলের জায়গা ছিল বিলালের দাদুর, তাই চার্চ কোনও আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ভ্যাটিকানও নাক গলাতে চেয়েছিল, কিন্তু সম্রাটকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলকারী আমান মীকাঈল আনডন ও তাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলকারী মঙ্গেসতু হাইলে মরিয়াম (১৯৭৪-১৯৯১) ছিল কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। মঙ্গেসতু দেশ থেকে ইসলাম ধর্মপালনের বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছিল। সে কমিউনিস্ট হলেও ধর্মপালনের কড়াকড়ি শিথিল করে দিয়েছিল। আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল!

-দাদু, আপনার স্কুল কি এখন সেই আগের যুগের মতো চলছে?

-তা কি আর হয়? সম্রাটের চার দশকব্যাপী দমন-পীড়নের কারণে হারার সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। লোকজনের মধ্যে বিধর্মীদের প্রভাব ঢুকে পড়েছিল পুরোমাত্রায়। আগের সমস্ত মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। যুবকশ্রেণি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা দিনরাত আলকাত (Khat) এর নেশায় ডুবে ঝিমুত। সম্রাটও আলকাতের চাষ বাড়াতে এখানকার চাষীদের উৎসাহিত করত। তার উদ্দেশ্য ছিল, এখানকার যুবকশ্রেণিকে নেশায় ডুবিয়ে রাখা। সম্রাটের উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছিল। আগে এই শহরকে বলা হতো, মদীনাতুল ইলমি ওয়াল ওলামা। আলেমদের শহর। এখন বলা হয়, মদীনাতুল জুহহাল। নিরক্ষর অজ্ঞদের শহর। সম্রাটের পরিকল্পিত সংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা জনপদকে হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছে। হারারে ইসলাম এসেছিল আরব ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। ভিন্নমতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগেই ইসলাম এসেছিল এখানে। সাহাবায়ে কেরাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাগরপথে মক্কা থেকে হিজরত ইরিত্রিয়া উপকূলে অবতরণ করেছিলেন। সেখান থেকে ইসলাম ক্রমান্বয়ে আদ্দিস আবাবা হয়ে হারারে এসেছিল। হারারে ইসলামের পুনর্জাগরণ হয়েছিল ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে। ইমাম আহমাদ বিন ইবরাহীম রহ. এর নেতৃত্বে। তিনি আরব থেকে এসে এখানকার মুসলমানদের একত্র করে শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি শহীদ হলেন ১৫৪৩ সালে। তার পরে সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আমীর নূর মুজাহিদ। তিনি ছিলেন ইমাম আহমাদ বিন ইবরাহীমের ভাগ্নে। তাকেই হারারের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তার শাসনামলেই হারার পরিণত হয়েছিল ইলম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রে।

আমীর নূর মুজাহিদ হারার শাসন করেছিলেন ১৫৬৯ সাল পর্যন্ত। এখনো হারারে তার বংশধররা বাস করে। হারারের ঘরবাড়িগুলো আজও আগের মতো ইসলামী রীতিতে নির্মিত হয়। সর্বত্র ইসলামী সভ্যতার ছাপ। রাস্তাঘাট, নগরপ্রাচীর, ঘরবাড়ি সবকিছুতে। আমীর নূর মুজাহিদ গোটা হারার শহরকে প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত করেন। পুরো শহরটা এখনো প্রাচীরবেষ্টিত। হারারের শহরপ্রাচীরের মধ্যেই মসজিদ ছিল ৯৩টা। বেশির ভাগই নির্মিত হয়েছিল খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগে।

-দাদু, আমি প্রাচীরটা দেখতে চাই!

-ঠিক আছে। আস্তে আস্তে সবই দেখবে। হারারের সর্বশেষ আমীর ছিলেন আবদুল্লাহ। তার শাসন শেষ হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। তারপর হারার খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যায়। ইতালিয়ানরাও কিছুদিন হারার শাসন করেছিল। হারারে ইউরোপিয়ান কারও প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৫২ সালে প্রথমবারের মতো একজন ইউরোপিয়ান হারারে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সে লোকটি ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিচার্ড ব্র্যাটন। আরব মুসলিম ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণ করে সে ধোঁকা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিল। রিচার্ড অনর্গল আরবীতে কথা বলতে পারত। এই ব্রিটিশ চরই পরে হারার সম্পর্কে লেখালেখি করেছিল। তার লেখার সূত্র ধরে সবার লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল হারারের ওপর। দীর্ঘকাল ধরে ইথিওপিয়ান সাম্রাজ্য ও হারারের ইসলামী সালতানাত পাশাপাশি বাস করে আসছিল। ইথিওপিয়ার ইউহানেস চতুর্থ (১৮৭১-১৮৮৯) হারার দখল করে নেয় ১৮৮৭ সালে। আচ্ছা, অনেক কথা হলো, এখন বলো আগামীকাল প্রথমে কী দেখতে যাবে?

-লাইব্রেরি!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-বাহ, খুব ভালো! তোমাকে আমি শায়খ শরীফের লাইব্রেরিতে নিয়ে যাব প্রথমে। সেখানে প্রায় এগারো শ বছরের পুরোনো কুরআনের নুসখা আছে, হাতে লেখা। এবং সেটা এখানকার মেয়েরাই লিখেছে। সেই মাদরাসাতুল উম্ম এর প্রথম দিককার কোনও এক ছাত্রী। কী সুন্দরই না হয়েছে সেটা, দেখলে বুঝতে পারবে! কুরআন শরীফটা হাতে নিলে তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে, সেটা কোনও এক মেয়ের হাতের লেখা!

-দাদু, আমার কী ইচ্ছে করছে জানো?

-কী?

-তোমার স্কুলে ভর্তি হয়ে যেতে! তোমার কাছে থেকে যেতে!

-বিশ্বের সেরা স্কুল ফেলে হারারের এই ঘুপচির স্কুল ভালো লাগবে বুঝি?

-তুমি যেভাবে স্কুলের ইতিহাস বললে, সত্যি সত্যিই লোভ জাগছে! আমি বড় হলে এমন একটা স্কুল খুলব! দেখে নিয়ো!

-আচ্ছা, সে সময় হলে দেখা যাবে!

***

তিন দিন পর জুমাইমা চলে গেল। আঙ্কেল একজন লোক পাঠিয়েছিলেন নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জুমাইমা আরও থাকতে চেয়েছিল। সে দাদুর স্কুল (মাদরাসা) নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করতে শুরু করেছিল। দাদুকে তার এত ভালো লেগেছে, সে সব ছেড়েছুড়ে দাদুর কাছে থেকে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তা কী করে হয়! সে চলে যাওয়াতে দাদু ভীষণ একা হয়ে গেলেন। কয়টা দিন তার কথা বলার সঙ্গী পেয়ে সময়গুলো ভালোই কেটেছে। আমি আরও কিছুদিন দাদুর কাছে থাকলাম। দাদুকে একাকী রেখে আদ্দিস আবাবায় যেতে মন চাচ্ছিল না। আঙ্কেল রোনে এর মধ্যে দুবার ফোন করেছেন। তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলেছেন। দাদুও বার বার তাগাদা দিচ্ছিলেন। অগত্যা বের হতে হলো। দাদুকে ছেড়ে যেতে মনটা কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। না গিয়েও উপায় নেই, শেষ পরীক্ষাটা দিতে হবে। আদ্দিস আবাবায় পৌঁছার পর শুনলাম, জুমাইমা মা-বাবার কাছেও বলেছে সে আর ফিরে যাবে না। দাদুর কাছে থেকে যাবে। তার কাছে থেকে পড়বে, গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের মতো নিজেকে গড়ে তুলবে! আঙ্কেল মেয়ের পাগলামি দেখে মিটিমিটি হেসেছেন। শুধু বলেছেন,

-ওটা তো মুসলিমদের!

-নাহ, খ্রিশ্চান মেয়েরাও পড়ে। মুসলিম ও খ্রিশ্চানদের আলাদা আলাদা সিলেবাস।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এবার আন্টি মুখ খুললেন। শক্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি কানাডাতেই পড়বে এবং পড়াশোনা শেষ করার আগে আর এখানে আসারও দরকার নেই। তোমার আব্বুও বদলি হয়ে যাবেন আগামী বছর। মাথা থেকে এসব ভূত নামাও। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করো। আগামী সপ্তাহেই তুমি ফিরে যাবে। টিকেট কাটা হয়ে গেছে।

জুমাইমা এবার আমাকে ধরল। আমিও আন্টির মতো কঠিন অবস্থান নিলাম। আর যা-ই হোক, আমি কিছু বললে, জুমাইমা সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিত। এবার একটু দোনোমনো করলেও মেনে নিয়েছে। সে ইউরোপীয় ঘরানার মেয়ে হলেও মন-মানসিকতা পুরোপুরি ইউরোপীয় পায়নি। এটা কি শৈশব-কৈশোর কানাডার বাইরে আফ্রিকার মাটিতে কাটানের ফল? কে জানে, হতেও পারে। আমি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ডুবে গেলাম। দিনরাত, আশপাশ সবকিছু ভুলে গেলাম। দাদুর কথাও সব সময় মনে ছিল না। ভেতরে কোত্থেকে একটা জেদ এসে গিয়েছিল। আমাকে পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। মেডিকেলে ভর্তি হতে হবে। পুরো হারার শহরে একজনও মুসলিম ডাক্তার নেই। চার্চের ডাক্তার দিয়ে কাজ চালাতে হয়। মিশনারি ডাক্তারগুলো পুরোমাত্রায় এ শূন্যস্থানের সুযোগ নিতে কসুর করে না। আমি একজন ডাক্তার হতে পারলে, আমার দেখাদেখি অন্যরাও সাহস পাবে। আরও আগেই মুসলিম ডাক্তার বেরিয়ে আসত! হারারের আলিমগণের ভুল সিদ্ধান্ত সবাইকে ভোগাচ্ছে। তারা সবাইকে বুঝিয়েছেন, এসব পড়াশোনা খ্রিষ্টানদের বিষয়। মুসলিম ছেলেরা পড়তে গেলে ঈমান থাকবে না। খ্রিষ্টান হয়ে যাবে, নয়তো নাস্তিক হয়ে যাবে। মুসলিম ছেলেরা শুধু কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ নিয়ে থাকবে!

-তা হলে চিকিৎসাসহ অন্য প্রয়োজন কীভাবে পুরো হবে?

-আল্লাহ তা'আলা খ্রিষ্টান ও বিধর্মীদের আমাদের কাজে নিয়োজিত করে দেবেন!

-পর্দানশীন নারীদের চিকিৎসা কীভাবে হবে?

-শরীয়তলঙ্ঘন করে চিকিৎসার কী প্রয়োজন?

এই ছিল তাদের চিন্তা। নিজেদের বদ্ধ চিন্তাকে দ্বীনের নামে চালিয়ে দিত। এদিকে মুসলমানরা খ্রিষ্টান ডাক্তারদের ফাঁদে পা দিয়ে দলে দলে খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। কেউ কেউ ধর্মান্তরিত না হলেও, মতান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তারা শত বছরের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে ধর্মমুক্ত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা দলে দলে অন্য শহরে গিয়ে কফি হাউজ আর বারে চাকরি নিচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে, দাদাভাই,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আব্বুসহ অভিজ্ঞরা বৈঠকে মিলিত হলেন। দাদু গার্লস স্কুলের মতো বয়েজ স্কুল খোলার প্রতি গুরুত্ব দিলেন। অথবা ধর্মীয় মাদরাসাগুলোর সিলেবাসকে ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দিলেন। তা যদি সম্ভব না হয়, অন্তত উল্টাপাল্টা ফতোয়া না দেয়া হয়, সেটা নিশ্চিত করা। মানুষকে বিভ্রান্ত করে এমন কথা যেন কোনও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব থেকে না আসে। যারা এ ধরনের উল্টাপাল্টা ফতোয়া দেয়, তাদের প্রায় সবাই বলতে গেলে ধর্ম সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই রাখে না। তাদের কুরআন পড়াও শুদ্ধ নেই। দশকের পর দশক খ্রিষ্টানদের চাপিয়ে দেয়া আগ্রাসনে সুষ্ঠু ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাহত হয়ে যাওয়াতেই সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। অর্ধশিক্ষিত বা নামমাত্র শিক্ষিত মানুষগুলোই আলিম পরিচিতি পেয়ে যাওয়াতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। ক্রমশ স্থবির হয়ে আসা হারারের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে হলে, দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ঘরানার শিক্ষা নিয়ে আসতে হবে বাইরে থেকে। এখানকার সবকিছুতে জড়তা ধরেছে।

***

জুমাইমা আজ চলে যাবে। সে এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগেও বলে গেছে, তার যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি কিছু বলিনি। একবার ভেবেছিলাম, জুমাইমা চলে যাওয়ার আগে বাসায় থাকব না। তার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সে কেন থাকার জন্যে এমন গোঁ ধরে আছে? ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবার ফুরসত মিলল না। পরীক্ষা এসে চলেও গেল। আমার পাশে সিট পড়েছিল একজন ইরিত্রিয়ানের। আসা-যাওয়ার পথে কথা বলতে বলতে মোটামুটি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুদিন আগে সে প্রস্তাব দিলো,

-আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবে?

-ইরিত্রিয়ায়?

-জ্বি।

-কিন্তু ওখানে তো যুদ্ধ লেগেই আছে।

-তুমি জানো, আমরা যুদ্ধ করতে চাইনি, আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। হাইলে সেলাস দীর্ঘ শাসনামলে (১৯৩০-১৯৭৪) পুরো সাম্রাজ্যজুড়ে মুসলমানদের ওপর চরম দমনপীড়ন চালিয়েছিল। এই অত্যাচারী মুসলিম বিদ্বেষী সম্রাট আক্রোশবশত ১৯৫২ সালে আমাদের ইরিত্রিয়া দখল করে নিয়েছিল অন্যায়ভাবে। ইরিত্রিয়ার বেশির ভাগ অধিবাসী মুসলমান। বিধর্মীয় কোনও বাহিনী মুসলিম ভূমি দখল করে নিলে, প্রতিরোধ গড়ে তোলা ফরয হয়ে যায়। আমরা ফরয আদায় করছি মাত্র। তুমি গেলে আমি খুশি হব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের কষ্টগুলো কাছে থেকে দেখে আসবে। তোমাদের হারারের ওপরও আদ্দিস আবাবা দীর্ঘদিন ধরে দমননীতি গ্রহণ করে আসছে। আমাদের ওখানটা ঘুরে এলে তুমিও হারার সম্পর্কে নতুন কোনও চিন্তার দিগন্ত পাবে!

-আমি দাদুর অনুমতি ছাড়া যেতে পারব না!

-আমি পরীক্ষা শেষ হলেই চলে যাব! তুমি দাদুর সাথে দেখা করতে গেলে, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

-আচ্ছা, পরীক্ষা শেষ হলে দেখা যাবে।

***

বেশি চিন্তা না করে ইরিত্রিয়া যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। দাদুকে জানাব না ঠিক করেছি। জানতে পারলে তিনি যেতে নাও দিতে পারেন। আঙ্কেলকে জানাব কি জানাব না, দোটানায় পড়ে গেলাম। শেষ মূহুর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম, বাড়ি যাচ্ছি ভাব নিয়ে আঙ্কেল-আন্টির কাছ থেকে বিদায় নেব। বন্ধুর বাড়ি রাজধানী আসমারার শহরতলিতে। দাদুর আব্বুও এখানে এসেছিলেন। ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিতে। এবার আমি এলাম। ইরিত্রিয়ার প্রতি আমাদের হারারী মুসলমানদের জন্মগত টান। এ দেশ সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতিবিজড়িত।

***

চারদিকে ঘোরা শেষ হলো। রাজধানীর বাইরেও যাব বলে স্থির করলাম। হাতে সময় আছে অল্প কটা দিন। এরপর বন্ধু তার কাজে চলে যাবে। আমাকে সময় দিতে পারবে না। আমারও বেড়ানো শেষ হয়ে গেছে। ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত শুরু করে দিলাম। এমনি কথাচ্ছলে জানতে চাইলাম,

-তুমি কোন কাজে যাবে?

-আছে একটা। তোমাকে বলা যাবে না!

-বলোই না, গুরুত্বপূর্ণ কিছু হলে, আমিও তোমার সাথে যাব!

-আমি সীমান্তে যাচ্ছি। ওখানে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যোগ দেবো। ইথিওপিয়ার জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

-আমিও যাব। নেবে?

-নতুন কাউকে নিতে হলে ছাড়পত্র নিতে হয়। আমি আগামীকাল যোগাযোগ করে তোমাকে জানাব। আশা করি পেয়ে যাব। তোমার সম্পর্কে আগেও আমীর সাহেবকে জানিয়েছি।

***

বাড়ি যাচ্ছি না দেখে দাদু চিন্তা করবেন। কীভাবে তার কাছে খবরটা পৌঁছানো যায় ভাবছি। সরাসরি বললে, সরকারি গোয়েন্দারা জেনে যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এমনিতেই সরকার মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখে। ইরিত্রিয়ায় আক্রমণ করার পর সন্দেহের মাত্রা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। সমস্যাটা বন্ধুকে জানালাম। সে হেসেই উড়িয়ে দিলো।

-ও এই কথা! তুমি মোটেও চিন্তা কোরো না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তোমার দাদুকে জানানোর ব্যবস্থা করছি!

-কীভাবে?

-পুরো ইথিওপিয়াতেই আমাদের লোকজন আছে। তোমাদের হারারেও আছে। কী জানাতে হবে বলো!

-শুধু জানাতে হবে, আমি ভালো আছি। এক জায়গায় বেড়াতে এসেছি। ফিরে গিয়ে বিস্তারিত বলব। বিশেষ কারণবশত বলে আসা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

-তোমার দাদু কি বেশি বৃদ্ধা? মানে তোমার সাহায্য ছাড়া চলতে পারেন না এমন?

-নাহ! আমার দাদু এখনো পুরোপুরি শক্ত ও কর্মঠ। চব্বিশ ঘণ্টাই কোনও না-কোনো কাজে ব্যস্ত। ছাত্রী পড়াচ্ছেন। ছাত্রীদের রান্নাবান্না তদারক করছেন। আমি না হলেও তার অগণিত ছাত্রী আছে। তারা তাকে মাথায় করে রাখে। দাদাভাই শহীদ হওয়ার পর বুকভাঙা শোকও তিনি ছাত্রীদের সযত্ন পরিচর্যায় কাটিয়ে উঠেছিলেন। তিনি মানুষটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের। তিনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সভ্যতাকে বুকে ধারণ করে আছেন। জন্মসূত্রে পেয়েছেন রেড ইন্ডিয়ান সভ্যতা। বেড়ে ওঠা ও লেখাপড়ার সূত্রে পেয়েছেন ইউরোপিয়ান সভ্যতা। দাম্পত্য ও কর্মজীবনের সূত্রে পেয়েছেন আফ্রিকান সভ্যতা। দাদুর চিন্তা কতটা স্বচ্ছ আর বাস্তবসম্মত একটা ঘটনা বললেই পরিষ্কার হবে! গাড়ি দুর্ঘটনায় পরিবারের প্রায় সবাই মারা যাওয়ার পর আমি বাড়ি গিয়েছি। দাদুকে দেখে অবাক। তিনি সারাক্ষণই কাঁদছেন কিন্তু কাজেকর্মে কথাবার্তায় তার কান্নার কোনও প্রভাবই পড়তে দেননি। আগের রুটিনেই স্বাভাবিক ছন্দে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে গেছেন।

-তাকে একবার দেখার বড় সাধ জাগছে।

-তিনি তোমার সাথে দেখা দেবেন না।

-কথাও বলবেন না?

-জ্বি, বলবেন।

-তা হলেই হবে। তার কাছে আমার অনেক কিছু জানার আছে। প্রশ্ন করার আছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-ঠিক আছে, হায়াতে বেঁচে থাকলে তোমাকে নিয়ে যাব। ইনশাআল্লাহ।

শুরু হলো নতুন জীবন। প্রশিক্ষণপর্ব দ্রুত সমাপ্ত হলো। সরাসরি জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হলাম এক ভোরে। মধ্যরাতে তাহাজ্জুদ পড়ে রওনা দিলাম, বহুদূরের পায়েহাঁটা পথ। পাহাড় ডিঙাতে হবে কয়েকটা। নিজের জীবনকে এতদিনে সার্থক মনে হচ্ছিল। যুগে যুগে হকের ঝান্ডা উঁচিয়ে ধরা দলের নগণ্য একজন সদস্য হতে পেরে মনটা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসছিল। প্রতিরাতেই কোনও না-কোনো ফ্রন্টে লড়াই চলত। এ ছিল এক অসম যুদ্ধ। ইথিওপিয়ার সাথে ছিল আমেরিকা-ব্রিটেনের মতো বড় বড় শক্তি। আমাদের সাথে আরবের সামান্য অর্থ সাহায্য। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য আর আমাদের প্রতি তার অশেষ করুণাই ছিল আমাদের প্রধান পাথেয়। এত আত্মত্যাগ আর কুরবানীর মধ্যেও একটা বিষয় মনে সারাক্ষণ খচখচ করে বিঁধত। ইরিত্রিয়ার পক্ষে বিভিন্ন দল লড়ছে, প্রায় সবাই জিহাদের আদর্শ নিয়ে লড়ছে না। তারা লড়ছে জাতীয়তাবাদ আর ভূ-রাজনৈতিক আদর্শে প্রভাবিত হয়ে সংকীর্ণ মানচিত্রের মোহে। তাদের একটা জাতীয় পতাকা হবে। তাদের একটি স্বতন্ত্র মানচিত্র হবে। তাদের একটি পার্লামেন্ট হবে। তারাও অন্যদের মতো জাতিসংঘের সদস্য হবে। তারাও ওআইসির সদস্য হবে। তারাও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘের সদস্য হবে। এই নিয়ে সুখস্বপ্নে বিভোর থাকত। ইসলাম ও শরীয়াহ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। তাদের আদর্শ কমিউনিজম ঘেঁষা ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা।

আমাদের দলটা এখন লড়ছে মুয়সাওয়া (Massawa) শহরে। দেখতে দেখতে অনেক দিন হয়ে গেল ময়দানে এসেছি। জিহাদের ময়দানে একবার এলে বাড়িঘরে ফিরতে মন চায় না। সারাক্ষণ শুধুই জান্নাতের চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে মাথায়। শাহাদাতের সুতীব্র নেশায় পেয়ে বসে। মুজাহিদ বাহিনী তাদের ঘাঁটি হিশেবে মুসাওয়া শহরকে বেছে নেয়ার একটা কারণ আছে। সাহাবায়ে কেরামের প্রথম দলটি হিজরত করে দীর্ঘ মরু ও সাগরপথ পাড়ি দিয়ে এই মুসাওয়াতেই অবতরণ করেছিলেন। ইসলামের প্রথম মসজিদও এই শহরেই স্থাপিত হয়েছিল—মসজিদটি রাসে মুদার (رأس مدر) নামে পরিচিত—সাহাবায়ে কেরামের হাতে। তারা হিজরত করেছিলেন হিজরতের আট বছর আগে রজব মাসে। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে। কত আগের ঘটনা, মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি, সাহাবায়ে কেরাম নৌকা থেকে নামছে। একজন উম্মুল মুমিনীনও আছেন! আরও কত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দৃশ্য ভাসছে। সাহাবায়ে কেরামের পদধূলির বরকতে এখানে স্বাধীন এক মুসলিম সালতানাত গড়ে উঠেছিল। সাগর পেরিয়ে মিসরের আসওয়ান পর্যন্ত এর সীমানা বিস্তৃত ছিল। ৯২৩ সালে তুর্কি সুলতান সলীম এ সালতানাতকে উসমানী খেলাফতের অধীনে নিয়ে যান।

***

আমাদের মুজাহিদ বাহিনী মরণপণ লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। যুদ্ধের মোড় আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। ইথিওপিয়া আলোচনায় বসতে সম্মত হলো। আমাদের ছাড়াই বৈঠক শুরু হলো। মুজাহিদ বাহিনী কোনওপ্রকারের আলোচনার পক্ষপাতী ছিল না। ইরিত্রিয়া স্বাধীন হলো। ক্ষোভে-দুঃখে সবার চুল ছেঁড়ার উপক্রম। এতদিন আমরা লড়লাম। আমাদের দলের বাইরের দলগুলোতে অন্য শিরোনামে সাধারণ মুসলমানরা লড়ল। কিন্তু স্বাধীনতাপরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসল একজন কমিউনিস্ট অর্থোডক্স খ্রিষ্টান। আসিয়াস আফওয়ার্কি। মুজাহিদ বাহিনীতে দ্বিধা তৈরি হলো। লড়াই চালিয়ে যাবে নাকি আপাতত রণে ভঙ্গ দেবেন। লড়াই চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তা হলে আমাদের লড়তে হবে এখন দুই শত্রুর সাথে। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ান সৈন্যদের সাথে। এতদিন যাদের সাথে মিলে শত্রু তাড়িয়েছি এখন তাদের দিকে বন্দুক তাক করতে হবে। কী করা যায়, সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাচ্ছিল না। তবে সীমান্তে ইথিওপিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলছিল।

এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে একটা বছর। দাদুকে নিয়মিত খবর পাঠিয়েছি। লোক মারফত জানিয়েছি, কোথায় আছি, কী করছি! আমাকে নিয়ে দাদু কী ভাবছেন সেটা জানার কোনও উপায় ছিল না। দিন দিন অবস্থা আরও করুণ হয়ে উঠছে। চারদিক থেকে ঘেরাওয়ের মধ্যে আছি। খাবারের সংকট দেখা দিলো। অস্ত্রও প্রায় ফুরিয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট আসিয়াস আমাদের অস্ত্রসংবরণ করতে অনুরোধ করলেন, নইলে কঠোর ব্যবস্থার হুমকি দিলেন। আমরা ছোট্ট জায়গার মধ্যে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাদের সামনে তিনটা পথ খোলা রইল :

১. আত্মসমর্পণ।
২. সরকারি বাহিনীতে যোগদান।
৩. ঘেরাও ভেঙে কৌশলে চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। পরে সুযোগ বুঝে প্রস্তুতি নিয়ে আবার ময়দানে ফেরা।

পরামর্শে শেষটা প্রাধান্য পেতে লাগল। আমীর সাহেব বার বার বৈঠকে বসছেন। সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। একরাতে আমরা গোপন শেল্টারে বসে আছি। আমীর সাহেব এসে বললেন, [তোমার] সাথে এক ভদ্রলোক দেখা করতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এসেছেন। আমি অবাক, এখানে কে আসবে? কে আসতে পারে? ভাবতে ভাবতে মাথা ব্যথা হয়ে গেল, কূলকিনারা করতে পারলাম না। কোনও হদিস বের হলো না। বাংকার ছেড়ে বাইরে এলাম। আমীর সাহেবের সাথে অনেকক্ষণ হাঁটার পর বড় রাস্তার পাশের এক ছোট্ট গলিপথে নামলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারেও আবছা আবছা দেখতে পেতাম। ময়দানে থাকার সুফল। সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমীর সাহেব আমাকে রেখে চলে গেলেন। দ্বিধা নিয়ে গাড়ির কাছে গেলাম। কাছে যেতেই চালকের দরজা খুলে গেল। দীর্ঘকায় একজন মানুষ নামলেন গাড়ি থেকে। আরেকটু যেতেই চমকে গেলাম। আঙ্কেল রোনে। আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা! তিনি এখানে? অসম্ভব!

-কেমন আছ 'সান'?

-ভালো আছি! আপনি কেমন আছেন? আন্টি কেমন আছে? আর জুমাইমা?

-সবাই ভালো আছে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি!

-আপনি এখানে কীভাবে এলেন?

-সেটা পরে শুনো!

-এখন আমার সাথে চলো! গাড়িতে ওঠো!

-কিন্তু আপনার সাথে আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা একটা কাজে আছি!

-আমি সব জানি! সবদিকে খোঁজখবর করে তবেই তোমাকে নিতে এসেছি!

-আমি আমার দলের সাথে বেঈমানি করতে পারব না। আমার আদর্শের সাথে বেঈমানি করতে পারব না।

-সেসব কিছুই করতে হবে না। আচ্ছা, এদিকে এসো।

***

আঙ্কেল আমার হাত ধরে গাড়ির পেছনের দরজার কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে বললেন :

-তোমরা কথা বলো। আমি আসছি।

বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। পেছনের দরজা খুলে গেল। সালামের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম,

-জুমাইমা?

-জ্বি, আমি।

-স্বপ্ন দেখছি না তো! তুমি তুমি এখানে কী করে এলে?

-সে অনেক কথা! আপনি আমাদের সাথে চলুন। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি সেই টরেন্টো থেকে ছুটে এসেছি।

-না জুমাইমা, তা হয় না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-কেন হয় না?

-আমাকে কাপুরুষ হতে বলছ? বেঈমান হতে বলছ?

-জ্বি না। আমি আপনাকে সব সময় বীরপুরুষ এবং ঈমানদার হিশেবেই কল্পনা করি। অতীতেও করেছি। ভবিষ্যতেও করে যাব। আমি একা ফিরে গেলে দাদু ভীষণ কষ্ট পাবেন। তিনিই বড়মুখ করে আমাকে পাঠিয়েছেন। কেন পাঠিয়েছেন বুঝতে পারছি না। আমি বললেই আপনি আমার কথা ধরে ফিরে যাবেন, এটা বিশ্বাস হতে চায়নি। তবুও দাদু অভিজ্ঞ মানুষ। তার কথা খুব কমই ভুল হতে দেখেছি।

-তুমি আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিলে দেখছি!

-আপনি আপনার আমীর সাহেবের সাথে কথা বলে আসুন। নিজেকে বেঈমান আর কাপুরুষ মনে হবে না।

-বা রে, বেশ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছ! আর তুমি এত সমঝদার কী করে হলে? দেড় বছরের মধ্যে এমন মুরুব্বি বনে গেলে?

-দাদুর সাথে থেকে থেকে!

-তোমার কথাবার্তা রহস্যময় হয়ে উঠছে। আচ্ছা, আমি আমীর সাহেবের সাথে কথা বলি।

আমীর সাহেব কাছেই ছিলেন। আমাকে রেখে চলে যাননি। আঙ্কেলের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন :

-বেলাল, সিদ্ধান্তটা সঠিক হচ্ছে কি না জানি না। আমাকে তোমরা সিদ্ধান্তের ভার দিয়েছ। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি, আপাতত আমাদের দলটা ভেঙে দেবো। এই ভদ্রলোক আমাদের জন্যে সাগরপথে বেরিয়ে যাওয়ার একটা এস্কেপ রুট ঠিক করেছেন।

-আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন তা হলে?

-জ্বি, চলে যাও। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমাদের আবার দেখা হবে। আমরা ভবিষ্যতে আবার মিলিত হব, আজকের আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে।

***

চলে এলাম। গাড়িতে চুপচাপ বসে আছি। গাড়ি ছুটে চলছে আসমারার দিকে। অসহ্য নীরবতা ভাঙলেন আঙ্কেল।

-তোমার কি মন খারাপ?

-এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না! ভেতরটা অনুভূতিশূন্য। কীভাবে কী হলো, খুলে বলুন তো?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-ঘটনা বেশি নেই। ইরিত্রিয়া স্বাধীন হলো, তুমি বেঁচে আছ, তারপরও বাড়ি ফিরছ না, তাই তোমার দাদু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তোমার দাদুর সাথে জুমাইমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তোমার নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ শুনে আমরা সবাই মুষড়ে পড়েছিলাম। সরকারি কোনও সংস্থা তোমাকে উঠিয়ে নিল কি না, ব্যক্তিগত কানেকশন কাজে লাগিয়ে খোঁজ নিলাম। পরে তোমার দাদুই খবর পাঠাল ভালো আছ। জুমাইমাও সামারের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিল ওর মায়ের কড়া নিষেধাজ্ঞা ঠেলে। মেয়ে থাকবে বাবা-মায়ের কাছে, তা না করে, সে দুটা দিন থেকেই হারারে ছুটে গেল। তোমার দাদু কী জাদু করেছেন কে জানে! পুরো ছুটিই ওখানে কাটিয়েছে। বাধ্য হয়ে তোমার আন্টিও ওখানে কিছুদিন থেকে এসেছে। তারপর থেকে তোমার আন্টির মুখ থেকেও তোমার দাদুর প্রশংসা বের হতে শুরু করল। আগে নিজেই মেয়েকে বাধা দিত। এখন আমিই তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারি না। কিছুদিন পরপরই সে হারার ছুটে যায়।

-আপনাদের সবার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। দাদুকে দেখে রেখেছেন।

-কী বলছ তুমি, আমরা তোমার দাদুকে দেখে রাখব কি, উল্টো উনিই আমাদের সবাইকে দেখে রেখেছেন।

-এক বছর পর আপনার বদলির কথা ছিল।

-জ্বি। আমাকে ইরিত্রিয়ায় বদলি করা হয়েছে। এতদঞ্চল সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেই হয়তো কৃর্তপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি চেয়েছিলাম কানাডা ফিরে যেতে। টানাহ্যাঁচড়ার কারণে জুমাইমার লেখাপড়া হচ্ছে না ঠিকমতো। তা হলো না।

-আমার অবস্থান কীভাবে বের করলেন?

-তোমার দাদু জুমাইমাকে চিঠি লিখেছিল, আমাকেও লিখেছিল, তোমাকে ফিরিয়ে নেয়ার কোনও ব্যবস্থা করতে। বিশেষ করে জুমাইমাকে বলেছিল। জুমাইমার অনুরোধ নাকি তুমি ফেলতে পারবে না। তাই শুধু তোমার জন্যে আমি তাকে কানাডা থেকে উড়িয়ে এনেছি। তোমার দাদিমার কথা ফেলি কী করে! তিনি আমাদের কানাডার গর্ব। তার মতো মেয়ে আমাদের দেশে জন্ম নিয়েছে, ভাবতেই ভালো লাগে।

-এখানে এলেন কীভাবে?

-আমি প্রথমেই বিভিন্ন ফ্রন্টে খোঁজ লাগালাম। খবর বের করতে দেরি হলো না। তারপর লোক পাঠিয়ে তোমার আমীরের সাথে যোগাযোগ করলাম। তাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম। তোমাদের দল তৎপরতা বন্ধ না করলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, সেটাও বললাম। এখন যুদ্ধকৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে, এটা বুঝিয়ে বলেছি তোমার আমীরকে।

-কারা সেই পরিস্থিতি তৈরি করবে?

-ইসরায়েল ও আমেরিকা।

-ইহুদীরা এখানে কীভাবে এল?

-তোমরা ফ্রন্টে থেকে কোনও খোঁজই রাখো না। এখনকার দিনে শুধু ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধ করলেই চলে না ইয়ংম্যান! চারদিকেও চোখ রাখতে হয়। চট করে কেন ইথিওপিয়া স্বাধীনতা দিতে রাজি হলো? এতদিন ধরে যুদ্ধ চালাল, আরও চালাতে পারত! আসলে পর্দার আড়ালে কিছু খেলা হয়ে গেছে। ইরিত্রিয়া মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। কিন্তু দেশের প্রধান একজন খ্রিষ্টান! এটা হয়েছে গোপন সমঝোতা চুক্তির আওতায়। সমঝোতা হতেই স্বাধীনতা পেয়ে গেল। স্বাধীনতার পর প্রথম স্বীকৃতিও কিন্তু ইসরাইল দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট আসিয়াসের প্রথম বিদেশ সফরও ইসরায়েলে।

-এই গরিব দেশে ইসরাইল কী পাবে?

-অনেক কিছুই পাবে। ইরিত্রিয়ার অধীনে অনেক দ্বীপ পড়েছে। তার মধ্যে দুটি দ্বীপ ইতিমধ্যেই ইসরায়েলের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। একটাতে ইসরায়েল সামরিক বেস স্থাপনের কাজ শুরু করেছে, আরেকটাতে চাষাবাদ। রাজধানী আসমারাকে ইতালিয়ানরা দ্বিতীয় রোম বলত। রোমের মতো করেই গড়ে তুলেছিল তারা এ শহরকে। এখন সে রোম হয়েছে মোসাদের অভয়ারণ্য। মুসলমানদের মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় বিশ হাজারেরও বেশি মুসলিম স্কলারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগে আরবী এখানকার প্রধান ভাষা ছিল। সব জায়গা থেকে আরবীকে হটিয়ে দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ইরিত্রিয়া আফ্রিকা ও আরবের সংযোগসেতু। এটা দখলে রাখতে পারলে, অনেক লাভ। সামরিক ও অর্থনীতি ভূ-রাজনীতি সবদিক থেকে। ইসরাইল এই লাভের প্রায় পুরোটাই নিজের পকেটে পুরতে সক্ষম হয়েছে।

***

আসমারা থেকে সোজা দাদুর কাছে চলে এলাম। দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর দাদুর সাথে দেখা। জন্মের পর থেকে এত দীর্ঘ সময় কখনো দাদুকে ছেড়ে ছিলাম না। আদ্দিস আবাবায় থাকতেও না। আগে দাদুকে জানাইনি আমি আসছি। হঠাৎ করে জাজ্বল্যমান আমাকে দেখে দাদু বাক্‌হারা হয়ে গেলেন। দুচোখের তারায় ফুটে উঠল ভীষণ খুশির ঝিলিক। এগিয়ে এসে হাত ধরলেন। দাদুকে কখনো মাত্রাতিরিক্ত আবেগ প্রকাশ করতে দেখিনি। আজ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটু বেসামাল হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলাম, তার প্রতি সত্যি সত্যি অন্যায় করে ফেলেছি। সবাইকে হারিয়ে ভীষণ একা হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর আমিও উধাও হয়ে গেলাম। দাদুর পুরো জীবনটাই এভাবে কেটেছে। অনেক কথা জমেছে! সবার আগে জানতে চাইলেন,

-জুমাইমা গিয়েছিল তোকে আনতে?

-জ্বি।

-ও কি চলে কানাডা চলে গেছে?

-জ্বি না।

-কবে যাবে বলেছে কিছু?

-তাও বলেনি। ও আমার সাথে কথাই বলেনি। এটা রাগ না অভিমান নাকি অন্য কিছু বুঝতে পারিনি।

-পাগলি মেয়ে অভিমান করেছে। এভাবে কেউ হারিয়ে যায়? যাক, আমি খুশি হয়েছি, তুই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়েছিস। লেখাপড়ায় দুই বছর পিছিয়ে পড়লি। এখন লেখাপড়ায় মন দে।

-আর লেখাপড়ায় মন বসবে? কতদিন হলো বইখাতার সাথে সম্পর্ক নেই!

-এটা বুঝি একজন বুঝদার মানুষের কথা হলো?

-কী পড়ব? কোথায় পড়ব?

-পরীক্ষার ফলাফল কেমন হয়েছে, সেটাও তো জানতে পারিসনি। আশাতীত ভালো করেছিস। রাজধানীতে গিয়ে দেখ, কোথায় ভর্তি হওয়া যায়। তোকে যেকোনও মূল্যে ডাক্তার হতেই হবে। হারারে একজন মুসলিম ডাক্তার কত বেশি জরুরি, বলে বোঝানো যাবে না। তুই কয়েকদিন থাক, তা হলে বুঝতে পারবি। একজন মহিলা ডাক্তারও প্রয়োজন। আমি জুমাইমাকেও বলেছি, ডাক্তারি পড়তে!

-সে ডাক্তারি পড়লে হারারের কী লাভ হবে?

-লাভ হবে কি হবে না, সেটা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে অসম্ভব কিছু আছে? তিনি চাইলে দিনকে রাত করতে পারেন! তোর কাজ তুই কর, জুমাইমারটা আমি দেখব।

-আচ্ছা, আমি না থাকাবস্থায় সে নাকি গ্রীষ্মের ছুটি পুরোটাই তোমার এখানে কাটিয়েছে? কী করেছিল সে?

-কী করেনি? পড়েছে। পড়িয়েছে। আমার সাথে গল্প করেছে। কাজ করেছে। রোগীদের সেবা করেছে। চিকিৎসা করেছে।

-সে ডাক্তারি পারে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-আমি শিখিয়ে দিয়েছি। সে থাকাতে অনেক উপকার হয়েছে। আমার মেয়েরা বেশ উৎসাহ পেয়েছে। তারা একজন শাদা মানুষের সাথে অকপটে মিশতে পেরে আনন্দিত হয়েছে।

-দাদু, একটা প্রশ্ন সব সময় মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায়। দাদাভাই মারা গেলেন, আগে ও পরে প্রায় সবাই চলে গেলেন, তোমার কষ্ট লাগে না?

-তুই আছিস, জুমাইমা আছে। এর বেশি আর কী চাই? আর কষ্ট? দেখছিস না কষ্টগুলো কীভাবে চোখের পানি হয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসছে? তারা চলে গেছেন। তাই বলে জীবন কি থেমে থাকবে? সেই একদম দুধের বয়েস থেকেই তো একের পর এক হারিয়ে আসছি।

-দাদাভাইয়ের অভাব অনুভব করো না?

-এমন একটা মুহূর্তও নেই, তাকে অনুভব করিনি। তিনি আমার কাছে কী ছিলেন, বলে বোঝাতে পারব না। তিনি আমার শুধু স্বামী ছিলেন না। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন, বাবার মতো ছিলেন, বড় ভাইয়ের মতো ছিলেন, পথপ্রদর্শকের মতো ছিলেন, শিক্ষকের মতো ছিলেন। তিনিই আমার প্রথম ও শেষ পুরুষ। সবচেয়ে বড় কথা আমি তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে পেয়েছি। ঈমান পেয়েছি। ইসলাম পেয়েছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছি। কুরআন কারীম পেয়েছি। সেই সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সুদূর আফ্রিকায় বাস করার হিম্মত পেয়েছি।

***

এক সপ্তাহ পরে আঙ্কেল রোনে আমাকে আদ্দিস আবাবা যেতে বললেন। তিনি আসমারা থেকে সেখানে এসেছেন। তার সাথে দেখা করলাম। জুমাইমাও তার সাথে এসেছিল। এসে শুনি সে দাদুর সাথে দেখা করতে গেছে। আঙ্কেল বললেন :

-আমি তিন দিনের জন্যে সরকারি এক কাজে এসেছি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ বছর আর মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার সময় নেই। মাত্র এক মাস আগেই ভর্তি শেষ হয়ে গেছে। ভাবলাম, এ সময়টা বসে বসে নষ্ট না করে, কিছু একটা করো।

-কী করতে পারি?

-আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। তুমি জানো কি না জানি না। ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সে পুরো কর্তৃত্ব ছিল আমেরিকার হাতে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সব বিমান কেনা হয়েছে আমেরিকা থেকে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম, ইথিওপিয়ার কাছে বিমান বিক্রি করতে। কিন্তু এয়ারলাইন্সের বড় বড় পদগুলোতে ছিল মার্কিন কর্মকর্তা। সত্তরের দশকের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাঝামাঝিতে এসে বিমানসংস্থার নিয়ন্ত্রণ ইথিওপিয়ানদের হাতে আসে। এবার আমাদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সফল হলো। ১৯৭৫ সালে তাদের কাছে একটা বিমান বিক্রি করতে সক্ষম হই। সে থেকে শুরু। আজও অটুট আছে। দূতাবাসে আমার দায়িত্ব হলো, বিমান ও পরিবহনের দিকটা দেখা। যাতে কানাডার তৈরি প্রোডাক্ট ইথিওপিয়ার বাজারে জনপ্রিয় করে তোলা যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু প্রস্তাব দিয়েছি রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের কাছে। তার মধ্যে একটা ছিল, আমার জন্যে একজন এ দেশীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা। আমি তোমার নাম প্রস্তাব করেছি। তুমি কি কাজটা করবে?

-আপনি বললে করব! তবে আমার ইচ্ছা ছিল, দাদুর সাথে থাকার!

-ভালো কথা। আমি চিন্তা করেছি, তুমি যদি পড়াশোনাটা কানাডাতে গিয়ে করতে, তা হলে ভালো হতো। এই চাকরিটা করলে, তোমার পড়াশোনার খরচা উঠে আসবে। আর কানাডা সরকারের অধীনে কাজ করার কারণে, ভিসা পাওয়াও সহজ হবে।

-আপনি আমার আর দাদুর জন্যে অনেক চিন্তা করেন। সেই কবে থেকে আপনার সাহায্যই পেয়ে আসছি।

-তোমার এসব নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। তোমার জীবনে উন্নতি হোক, এটাই আমার কামনা। তোমার দাদু চান, তুমি একজন যোগ্য ডাক্তার হও। তোমার হারারের কল্যাণের জন্যেই তিনিই এটা চান। অসহায় গরিব মানুষগুলোর চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্যে। তোমার দাদু আমাকে বার বার করে বলেছেন, আমি যেন তোমার লেখাপড়ার দিকটা দেখি।

-ঠিক আছে আঙ্কেল, আমি চাকরিটা করব।

-তা হলে তুমি গোছগাছ করে আগামী সপ্তাহে চলে আসো। আমি সব ঠিকঠাক করে যাব। আর জুমাইমাকে সময়মতো বিমানে তুলে দিয়ো।

***

হারারে ফিরে এলাম। দাদু সারাক্ষণ জুমাইমাকে নিয়েই ব্যস্ত। আমার দিকে ফিরে তাকানোরও ফুরসত নেই। অবাক লাগছে, জুমাইমাকে দেখে মনেই হয় না, সে একজন খ্রিষ্টান মেয়ে। দিব্যি দাদুর সাথে সব কাজে অংশ নিচ্ছে। ছায়ার মতো দাদুর সাথে লেপ্টে আছে। দাদু শুধু একবার জানতে চেয়েছেন, জুমাইমাকে তোর কেমন লাগে? আমি উত্তর দিলাম,

-সে ভালো মেয়ে। তাকে ভালো না লেগে উপায় নেই।

-সে চায় তোর সাথে থেকে যেতে!

-সে কি করে সম্ভব?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-বোকা ছেলে, সম্ভব করার দায়িত্ব আমার। আমি বলি কি, তুই একবার তার সাথে কথা বলে দেখ! ও তোর সম্পর্কে কী ভাবে জেনে নে!

-ঠিক বলেছ দাদু, জুমাইমার সাথে আমার একবার বসা দরকার। ওর আচরণগুলো দিন দিন রহস্যময় হয়ে উঠছে। সে যদি অন্যরকম কিছু ভাবে, তা হলে তার ও আমার উভয়ের সমস্যা। সে যদি সব সমস্যার কথা জানার পরও আগে বাড়তে চায়, আমার আপত্তি নেই।

***

দাদু জুমাইমাকে ডাকতে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। জীবন নিয়ে কত কি ভেবে ভেবে হয়রান ছিলাম, এখন জীবন বইছে কোন খাতে। আমার জীবনের লাগাম আমার হাতে নেই। ময়দানে থাকতে কল্পনা করতাম, আর কখনো বের হব না, শহীদ হওয়া পর্যন্ত একটানা আল্লাহর রাস্তায় লেগেই থাকব। শহীদ হওয়ার আশায় ইরিত্রিয়া স্বাধীন হওয়ার পর মাটি কামড়ে পড়ে রইলাম। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা ছিল ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা হয়তো অন্যভাবে কাজ নেয়ার ফয়সালা করে রেখেছেন। আচ্ছা, আমি কি ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছি? নাহ, তা কি করে হয়। আমাদের পিছিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না। অস্ত্র নেই, খাবার নেই, সামনে শত্রুও নেই। এমতাবস্থায় কীভাবে যুদ্ধ করি? কার সাথে করি? আর পিছিয়ে আসা হয়েছে, সর্বসম্মত পরামর্শক্রমে। এটা নিয়ে মনে কোনও ধরনের গ্লানি থাকা উচিত নয়।

আমার এখন হারারকে নিয়ে ভাবতে হবে। এখানকার শিক্ষা, চিকিৎসা, মূল্যবোধ নিয়ে। কীভাবে হারারকে আদ্দিস আবাবার খ্রিষ্টান বলয় থেকে বের করে, আগের নিষ্কলুষ ইসলামী ভাবধারায় ফিরিয়ে আনা যায়, তার জন্যে কাজ করতে হবে। যেসব মেয়েরা হারার ছেড়ে চলে গেছে, জীবিকার নাম করে, তাদের ঘরে ফেরানোর যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। এখানেই তাদের জন্যে সম্মানজনক আর্থিক বন্দোবস্ত করতে হবে। তাদের আগের মতো শিক্ষাব্রতিনী করে তুলতে হবে। এখানেই একটা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। দাদু থাকতে থাকতে, দাদুর গড়ে তোলা ছাত্রীদের পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। তারা যেন প্রত্যেকে সুগৃহিণী হতে পারে, তার জন্যে উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দিতে হবে। এমন সুযোগ্য পাত্রীদের যারা পাত্র হবে, তারাও যেন কিছুটা যোগ্যতা অর্জন করে সংসারধর্ম শুরু করতে পারে, তার উদ্যোগ নিতে হবে। কত কাজ! আরে বসে বসে ভাবছি, দাদু এলেন না যে এখনো? জুমাইমা আসতে রাজি হচ্ছে না? কথা বলতে আগ্রহী নয়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

***

-দাদুউউউ! ও দাদুউউ!

-এই তো আসছি! জুমাইমা এইমাত্র স্কুল থেকে ফিরল। ভীষণ ক্লান্ত। এ অবস্থায় তোর সাথে বসতে লজ্জা পাচ্ছে। আর এখন মানসিকভাবে প্রস্তুত নয় বলছে।

-আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমিই কিন্তু আগে বেড়ে উৎসাহ দেখাচ্ছ। পরে ভিন্ন কিছু হলে আমার দোষ নেই।

-তুই একটা বুদ্ধু! জুমাইমার মতো একটা মেয়ে বুঝি আমার মতো বুড়ির কাছে থাকতে আসে? হোক না বয়েস কম, তুই ওর সাথে কথা বলে দেখলে বুঝতে পারবি, বয়েসের তুলনায় সে কতটা অগ্রসর! তার ভাগ্যটা আসলেই ভালো। অত্যন্ত ভালো বাবা-মা পেয়েছে। তারপর শিক্ষক হিশেবে পেল তোকে।

-আমি তাকে আর কীই-বা শিখিয়েছি! সে-ই উল্টো আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে।

-নাহ, সে তোর কাছেই প্রথম শালীনতা শিখেছে। চলাফেরায় পরিমিতিবোধ শিখেছে। বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা পেয়েছে। সেই ছোট বয়েসেই নিজেকে রেখেঢেকে রাখতে শিখেছে। অপ্রয়োজনে সময় নষ্ট না করে, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে শিখেছে। স্কুলে পেয়েছে সুদানি বান্ধবী। তার প্রভাবও জুমাইমার জীবনে অনস্বীকার্য। কানাডায় পেয়েছে এক পাকিস্তানি শিক্ষিকা। সবমিলিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি খাস রহমত নাযিল করেছেন। আমি প্রথম দিন ওর সাথে কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলাম, সে আর দশজন ইউরোপিয়ান মেয়ের মতো নয়। তাদের মতো হলে, সে তোকে ও আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এতদূর ছুটে আসত না। ওর সাথে কথা বললে, সে তোকে জানাবে। আমি সব জানিয়ে দিলে, পরের মজা নষ্ট হয়ে যাবে।

-দাদু, আমি পরীক্ষার পর না আসাতে তুমি কীভাবে ওর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলে?

-আমি করিনি। সে-ই অগ্রণী হয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। সে চিঠি লিখেছিল তার বাবার কাছে। তার বাবা আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি মনে মনে তার সঙ্গ কামনা করছিলাম। এমন সময় তার চিঠি হাতে পেয়েছিলাম। তারপর থেকে আমিও লিখেছি সেও লিখেছে। চিঠির মাধ্যমে দুজনের মধ্যে একটা অসম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তাকে চিঠি লেখাটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তোকে চিঠিগুলো দেখাব। সে আমাকে লিখত সে কী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পড়ছে, কী শিখছে, কী জানছে, কী দেখছে, কী ভাবছে! আমি তাকে লিখে জানাতাম কী শিখেছি শিখছি, কী ভেবেছি ভাবছি, কী জেনেছি জানছি, কী দেখেছি দেখছি! আমার চিঠিগুলো পড়ে ও যেমন অনেক কিছু জানতে পারত, আমিও তার চিঠি পড়ে অনেক কিছু জানতে পারতাম। শিখতে পারতাম। উন্মুক্ত পৃথিবীর সন্ধান পেতাম। এমনকি তোদের সংবাদও পেতাম তার কাছ থেকে!

-আমাদের সংবাদ? কীভাবে?

-আমি তাকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম, তুই ইরিত্রিয়া গিয়েছিস। ইথিওপিয়ার জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে! বিশ্বাস করবি না, জুমাইমা ব্যাপারটাতে এত বেশি মুগ্ধ হয়েছিল, পারলে সেও তৎক্ষণাৎ তোর সাথে যোগ দেয়ার জন্যে ইরিত্রিয়া চলে যায় যায় অবস্থা। সে বাবার মাধ্যমে ও এক মহিলা সাংবাদিকের মাধ্যমে নিয়মিত ইরিত্রিয়ার সংবাদ রাখতে শুরু করল। যা জানত, সাথে সাথে আমাকে লিখে জানাত। কানাডার এক পত্রিকায় সে নিয়মিত ইরিত্রিয়াবিষয়ক লিখতেও শুরু করেছিল ছদ্মনামে। ওটা নিয়েও মজার ঘটনা। সম্পাদক ভেবেছিল বড় বয়েসের কেউ লিখছে। পরে খোঁজ নিয়ে আসল মানুষের হদিস উদ্ধার করে তো তারা থ। এই মেয়ে এত দূরদৃষ্টি কীভাবে পেল? কোথায় কানাডায় বসে সুদূর ইরিত্রিয়ার ফ্রন্টলাইনের তরতাজা খবর সংগ্রহ করছে। আবার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণও দিচ্ছে!

তুই ময়দানে থাকাবস্থায় সে বেড়াতে এসেছিল ইরিত্রিয়ায়। সে-ই মহিলা সাংবাদিকের সাথে সে ফ্রন্টলাইনেও চলে গিয়েছিল। চুরি করে। বাবা-মায়ের অগোচরে। কেন গিয়েছিল বুঝতেই পারছিস। তোকে খোঁজার জন্যে। যদিও বাবা-মাকে বলেছে, সে ভবিষ্যতে ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি শখের সাংবাদিক হবে, তাই একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের সাথে হাতেকলমে শিখতে গিয়েছে। সে মহিলা সাংবাদিকও টের পায়নি জুমাইমা তার সাথে সাথে এতদূর গিয়েছে।

-এ তো ভীষণ দস্যি মেয়ে দেখছি!

-এ আর দস্যিপনার কি দেখলি! ও যেসব দুঃসাহসিক ভাবনা ভাবে, সেসব জানতে পারলে আমার মনে হয় তুই তার ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে চাইবি না। তার মা আমার কাছে আক্ষেপ করে বলেছে, তার মেয়েটা কেন যে এমন বেয়াড়া হয়ে বেড়ে উঠল! ডরভয় কিছুই নেই। তবে বেয়াদব নয়। মায়ের কথা মন দিয়ে চুপটি করে শোনে। কোনও বিষয়ে মায়ের সাথে একমত হতে না পারলে, ঠান্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে মাকে নিজের মতে এনে ছাড়ে। মেয়ের উসিলায় বাবা ও মা উভয়েই এখন হেদায়াতের প্রায় কাছাকাছি। আগে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জুমাইমার মা বোধহয় আমাদের পছন্দ করত না, কিন্তু মেয়েকে দিন দিন ভালো হতে দেখে, মাও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এখানে এসে থেকে গেছে। আমাদের স্কুলে শ্রম দিয়ে গেছে। ছাত্রীদের সাথে সময় কাটিয়ে গেছে। আমাদের স্কুলের মেয়েদের সাথে সময় কাটালে, যে কারও ভালো লাগবে।

-দাদু, আমি জুমাইমার সাথে এখন আর বসতে চাই না।

-কেন?

-আগে আঙ্কেলের মতামতটা জেনে নিই। তারপর।

-সেটা নিয়ে তোর ভাবতে হবে না। কানাডার বিয়ের বয়েস আঠারো। তার অপেক্ষায় আছি। সময় হলে আমি প্রস্তাব দেবো। রাজি না হলে, তখন দেখা যাবে। অবশ্য বিশেষ অবস্থায় বয়েস ষোলো হলেও নাকি বিয়ের একটা ব্যবস্থা কানাডার আইনে আছে।

-সেটা কাগজে-কলমে বিয়ের বয়েস। এটা সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী আইন।

-আচ্ছা, আমি জুমাইমার সাথে কথা বলে দেখি।

***

দুজনে মুখোমুখি বসা আর হয়ে উঠল না। জুমাইমা কানাডা চলে গেল। আমি আর দাদু আবার একা। চাকরিতে যোগ দেয়ার সময় হলো। আদ্দিস আবাবায় চলে এলাম। শুরু হলো আমার চাকুরেজীবন। বেশিদিন চাকরি কপালে ছিল না। সমস্যা দেখা দিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে। চাকরির তৃতীয় মাসে, আঙ্কেল রোনে আদ্দিস আবাবায় এলেন। আমাকে ডেকে বললেন :

-ইথিওপিয়ার সরকার একটা তালিকা তৈরি করছে গোপনে।

-কিসের তালিকা?

-ইথিওপিয়া থেকে কারা কারা ইরিত্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করেছে তাদের তালিকা।

-খুব সম্ভব তোমার নামও তালিকায় আছে। আমি জানতে পেরেছি এক জেনারেলের সূত্র ধরে। তিনি আমাদের কানাডার পক্ষে কাজ করেন। এখানকার সরকার যেন কানাডার বিমান ও পণ্য কেনে, এ বিষয়ে লবিং করার দায়িত্ব তার। তালিকাটা চূড়ান্ত হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

-আমি এখন কী করতে পারি?

-বেঁচে থাকতে চাইলে খুব দ্রুত দেশত্যাগ করতে হবে।

-কিন্তু কোথায় যাব? ইরিত্রিয়া বা সুদান?

-ওদিকে গেলে সমস্যা দেখা দেবে! ভবিষ্যতে আর আইনসংগতভাবে দেশে ঢুকতে পারবে না। তুমি খুব দ্রুত পাসপোর্ট করে ফেলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিমানে ওঠার আগেও ভাবতে পারিনি, শেষ পর্যন্ত আকাশে উড়তে পারব। বিমান যতক্ষণ মাটিতে ছিল, ভয়ে ভয়ে ছিলাম, এই বুঝি ধরতে এল। এই বুঝি ফ্লাইট বাতিলের ঘোষণা এল। না, সেসবের কিছুই ঘটল না। বিমান নিরাপদেই আকাশে উড়াল দিল। বিমান এগিয়ে যাচ্ছে অসীম আকাশের দিকে। আমি এগিয়ে যাচ্ছি একটি সসীম স্বপ্নময় জীবনের দিকে। জুমাইমার মতো একটা মেয়েকে সাথে পেলে দুনিয়া জয় করে ফেলতে পারব। ইনশাআল্লাহ। এত সহজে দুজন কাছাকাছি আসার সুযোগ পাব, কল্পনাতেও আসেনি। তাকে কাছে পাওয়ার জন্যে, নিজের জীবনসঙ্গী করে ঘরে তোলার জন্যে কতভাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছি, কিন্তু কোনওটাই শেষ পর্যন্ত যুক্তিসংগত মনে হতো না। ছুড়ে ফেলে নতুন আরেক পরিকল্পনায় ডুবে যেতাম।

***

সেদিন আঙ্কেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, দ্রুত পাসপোর্ট অফিসে গেলাম। সাথে কানাডা দূতাবাসের সুপারিশ থাকাতে সবকিছু দ্রুত হয়ে গেল। সে-ই জেনারেলই আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে যাবতীয় মুশকিল আসান করে দিয়েছেন। পাসপোর্ট হওয়ার পর আঙ্কেল আমাকে নিয়ে সোজা দাদুর কাছে গেলেন। তিনজন মিলে বৈঠকে বসলাম। দাদু সব জেনে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।

-এখন কী হবে? আমাদের হারারের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার কী হবে?

-আপনি চিন্তা করবেন না। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ওকে কিছুদিনের জন্যে কানাডা পাঠিয়ে দিতে চাই! আপনার আপত্তি আছে?

-আমার কেন আপত্তি থাকবে? আগে পরে সে ডাক্তারি পড়ার জন্যে কানাডায় যাওয়ার কথাই ছিল।

-কিন্তু তার যাওয়াটা স্বাভাবিক হচ্ছে না। ধরপাকড় শুরু হলে, সে আর কখনো দেশে ফিরে আসতে পারবে না। আমি তাকে কয়েক মাসের টুরিস্ট ভিসা সংগ্রহ করে দিতে পারব। কানাডা চলে যাওয়ার পর, চেষ্টা-তদবির করে কাজ করার অনুমতিও আদায় করে দিতে পারব! কিন্তু এ দেশের সামরিক সরকার যদি কানাডা সরকারের কাছে আবেদন করে, আমাদের সরকার নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে, বিলালকে ইথিওপিয়ান কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে। এটা ঠেকানোর একটা উপায় হতে পারে, সে গোপনে আমেরিকা পালিয়ে গেল। কিন্তু হারার নিয়ে তার ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা? এখানকার মানুষগুলো নিয়ে তার এতদিনের স্বপ্ন? সবই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

-তা হলে উপায় কী?
-আরেকটা উপায় অবশ্য আছে। তাকে কোনও উপায়ে কানাডার নাগরিকত্ব পাইয়ে দেয়া। কিন্তু এটা এত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। অল্প সময়ে নাগরিকত্ব পেতে হলে ওখানকার কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

***

আঙ্কেল কথা থামাতেই দাদু বললেন :
-রোনে, তুমি আমার একমাত্র নাতিকে বাঁচানোর জন্যে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে না?
-কেন পারব না। অবশ্যই পারব।
-আমি যদি বলি, জুমাইমাকে আমরা পাত্রী হিশেবে চাই, তুমি কি রাগ করবে?
-কী বলছেন আপনি। আমরাও তা-ই চাই। জুমাইমার আম্মু আগে রাজি ছিল না। এখন আপনি জানেন, সেও আপনাকে অত্যন্ত পছন্দ করে।
-আলহামদুলিল্লাহ। আমার বুক থেকে বিরাট এক পাষাণ নেমে গেছে।

***

বিমান চলছে। আমিও চলছি। বিমান এগুচ্ছে তার গন্তব্যের দিকে। আমি এগুচ্ছি হৃদয়নোঙরের দিকে। ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনাগুলো একে একে ভেসে উঠতে থাকল। দুজনেই ডাক্তারি পড়লেও দুজনের পড়ার বিষয় ভিন্ন হবে। সে মনোযোগ দেবে নারীবিষয়ক সমস্যাগুলোর দিকে। দুজনে মিলে হারারকে গড়ে তুলব একটি সুন্দর জনপদে। আমাদের সন্তানরা বেড়ে উঠবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকময় সমাজে। ইনশাআল্লাহ।

সমাপ্ত

আলহামদুলিল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com